অবক্ষয়

শৈলেন পালচৌধুরী

॥ পরিবেশক ॥

অনন্য প্রকাশন

৬৬, কলেজস্ট্রীট (দ্বিতল)

কলিকাতা-১২

প্রকাশক : অতীন পালচৌধুরী
তারামা প্রকাশনী
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : শিবনারায়ণ চক্রবর্তী ঠাকুর
ঠাকুর প্রিন্টার্স
৬৭বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

প্রথম সংস্করণ : মহালয়া, ১৩৬৬

উৎসর্গ—

পরমারাধ্য গুরুদেব—

শ্রীশ্রীপাগল যোগানন্দ বাবার

করকমলে ॥

এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই কাল্পনিক। বাস্তবটুকু বুঝে নেবার দায়িত্ব সহৃদয় পাঠকের উপরই ছেড়ে দিলাম।

আমার কনিষ্ঠ সহোদর কল্যাণীয় শ্রীঅতীন পালচৌধুরী ব্যবসায়িক দিকে দৃষ্টিপাত না করে গ্রন্থটি প্রকাশের যে দুঃসাহস দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না। কল্যাণীয় শ্রীনবীন ঘোষ ও অগ্রজতুল্য শ্রীসতীশ সেনগুপ্ত যেদিন যেটুকু লিখেছি তা পাঠ করেই আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। মুদ্রণের ব্যাপারে শ্রীশিবনারায়ণ চক্রবর্তী ঠাকুর ও পরিবেশনার ব্যাপারে শ্রীহীরক রায় মহাশয়ের আন্তরিক সংযোগিতা ভোলবার নয়। তাদের সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

শৈলেন পালচৌধুরী

সরকারী কেতাবে রাস্তাটার নাম ন্যাশনাল হাই-ওয়ে। জন-সাধারণের মুখে মুখে দিল্লী রোড—যেন দিল্লী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। আসলে মোটেই তা' নয়। বালী ব্রীজ থেকে শুরু হয়ে মাঠ-ময়দান খানা-খন্দ বন-বাদাড় ভেঙ্গে মাঝে-মধ্যে গেরস্থের ঘর-বাড়ি পিষে দিয়ে চন্দননগরের কাছে জি. টি. রোডের সঙ্গে গিয়ে গাঁটছড়া বেঁধেছে। দিন-রাত্রি হু হু করে বেসামালভাবে মালবোঝাই লরী ছোটে। জি. টি. রোডের ভীড় এড়াতে নাকি দিল্লী রোডের দরকার হয়েছিল। দু'ধারে পেট্রোল পাম্পও হয়েছে কিছু কিছু। সুযোগ বুঝে ব্যবসায়ী লোকেরা লরীওয়ালাদের জন্যে হোটেল খুলে বসেছে সুবিধামত জায়গায়। সর্দারজীরাও পিছিয়ে নেই। তাদের হোটেলেই বরং খদ্দের বেশী হয়। কারণ লরীর ড্রাইবার শতকরা পঁচানব্বইজনই পাগড়ী বাঁধা ঝুঁটিওলা। দিনরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে হোটেলগুলো। চাপাটি থেকে চোলাই পর্যন্ত পরিবেশিত হয়। তবে ঐ শেষ বস্তুটি রাত্রিতেই আত্মপ্রকাশ করে বেশী। সাপ্লাই দেয় আশে-পাশের মানুষেরা। বোতলে ব্লাডারে যখন যাতে সুবিধা হয়, তাতেই ভর্তি করে তরকারীর ঝুড়িতে সাজিয়ে উপরে কিছু শাকপাতা চাপিয়ে নিয়ে আসে। মেয়েরাও বেশ রপ্ত করে নিয়েছে ব্যবসাটা। তরকারীর ঝুড়ি মাথায় চাপিয়ে, কোমড়ের কাছে মালভর্তি ব্লাডার বেঁধে দিব্যি চলে আসে, দেখলে মনে হয় যেন এখন-তখন অবস্থা।

বর্ষায় মাঝে মাঝে বিশ্রামও পায় রাস্তাটা। জায়গায় জায়গায় দু'পাশের জমি ভরে জল দাঁড়ায়। জল সরে গেলে পিচ কেটে নুড়ি বেরিয়ে পড়ে। দু'চার দিন লরী চললে সেগুলোকে রাস্তার বেওয়ারিশ বুড়ো কুকুরগুলোর ছাল-বাকল ওঠা পিঠের মতো দেখায়। লরীগুলো তখন বাধ্য হয়ে জি. টি. রোডের দিকে মোড় নেয়।

হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বেলা বারোটা বাজে। জ্যৈষ্ঠ মাস, বেজায় কড়া রোদ উঠেছে। রাস্তার পিচ্ গলে গেছে জায়গায় জায়গায়। লরীগুলো সপ সপ্ করে দুরন্ত গতিতে তার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দিনের বেলায়ও এসব জায়গা খুব নিরালা। রাত্রিতে তো কথাই নেই। কুচি কুচি করে কেটে ধানক্ষেতের ধারে ফেলে রাখলেও কেউ খোঁজ করতে আসবে না। চলন্ত লরী দেখে বাঁচবার জন্য চিৎকার করলেও কেউ থামবে না। লরীওলারাও যে মাঝে মাঝে দু'চারজন বিপদে না পড়েছে তা' নয়। দেখা গেছে ড্রাইবারকে ছুরি মেরে ডোবার ধারে ফেলে রেখে দুর্বৃত্তেরা লরী নিয়ে উধাও। আবার এমনও হয়েছে, লরী বোঝাই মালের মালিককে কোনো নির্জ্জন স্থানে খুন করে লরীর ড্রাইবার নিজেই লরী নিয়ে বেপাত্তা। ড্রাইবার ধরা পড়েছে তো মাল পাওয়া যায় নি, মাল পাওয়া গেল তো ড্রাইবারের কোনো খোঁজ নেই।

দক্ষিণমুখী হেঁটে চলেছি। দূরে দূরে কিছু কলোনী হয়েছে। ধারে কাছে খুব ঘন বসতি নেই। ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিটানো কিছু স্থানীয় লোকের ডেরা। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নিশুতি-রাত্রির স্তব্ধতা নামে। আগে আগে গভীর রাত্রিতেও বাঁশ বাগানের আনাচে কানাচে কিছু আলো দেখা যেতো। চোলাই-এর ভাঁটি-

চাপানোর আলো। কিন্তু আবগারীর কড়া নজর থাকায় কয়েক বছর ধরে কড়াই একেবারে মেজে-ঘষে সিকেয় তুলে রাখতে হয়েছে। তবে মন-পাগল-করা এই নির্যাস-শিল্পের মায়ার বাঁধন বড় কঠিন জিনিষ। তাই অনেকেই চলে গেছে আরো ভেতরের দিকে, কিছুটা নিরাপদ জায়গায়।

সামনেই কনস্ট্রাক্‌শন চলেছে একটা লোহা লক্কড়ের কারখানার। প্রাথমিক কাজের জন্যে স্থানীয় কিছু ছেলে চাকরীও পেয়েছে সেখানে। আমিও চলেছি সে-আশায়ই।

দু'বছর হয় বি. এস্‌-সি. পাশ করে বসে আছি। বড়দা এম. এস্‌-সি.-তে ভর্তি হ'তে বলেছিলেন। কিন্তু আমার ভালো লাগে নি। হয়তো আমার মতো অবস্থায় পড়লে অনেকেরই ভালো লাগতো না। সেদিন বড়দা দুঃখ করে বলেছিলেন, "কী করলি বসে থেকে থেকে? এতো দিনে পরীক্ষাটা দেয়া হয়ে যেতো। কী যে ভাবিস্ তোরা, কিছুই বুঝি না!"

এক একবার মনে আসে, লেখাপড়া না শিখলেই হয়তো ভালো হ'তো। যে-কোনো কাজকর্ম করতে মর্যাদায় বাঁধতো না। গাড়ীতে গাড়ীতে চানাচুর কিংবা আট আনা দামের পেন ফেরি করলেও একবার মনে জাগতো না—কাজটা আমার উপযুক্ত হয় নি। বুঝি, এ রকম ভাবা নীতিগতভাবে ঠিক নয়। যখন সব রকম কাজকে সমাজে সমান মর্যাদা দেওয়া হবে তখন আর এ-ভাবনা আসবে না। যখন শিক্ষার মাপকাঠি দিয়ে কাজের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হবে না তখন আমাদের বর্তমান মানসিকতা হয়তো অত্যন্ত সহজভাবেই মুছে যাবে। কিন্তু যতদিন ভেদাভেদ থাকছে ততদিন নিজেকে এ-সবের উর্ধে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমার নেই। অনেকেরই থাকে না।

এই দু'বছরে মোটামুটি একটা ভদ্রগোছের চাকরীর জন্যে না হ'লেও পঁচিশটা দরখাস্ত পাঠিয়েছি। ইন্টারভ্যু এসেছে ছ'জায়গা থেকে। সব জায়গায়ই আশা নিয়ে গিয়েছি—আমার হয়তো হ'লে হয়েও যেতে পারে। কিন্তু সব শালারা, যারা আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় দেখতে বসে, মনে হয় যেন এক-একজন পয়গম্বর। সংসারের সবকিছু জেনে বসে আছে!

আসলে ভেতরে ধরাধরি না করলে কিছুই হয় না। মেরিট দেখে সিলেক্‌শনের দিন চলে গেছে। কেউ তা' আশা করে না। এখন যার বড় হাত আছে, সে-ই হাত বাড়িয়ে কিছু পেতে পারে।

অমলেশের কথা মনে হয়। আগে মাহেশে থাকতো, মাস কয়েক হয় কুমীরজলা রোডে বাড়ি করেছেন তার বাবা। স্কুলে এইট পর্যন্ত এক সঙ্গে পড়েছি। তারপর ও চলে গেছে কমার্স লাইনে। যথা সময়ে বি. কম. পাশ করেছে। পাশ করবার কয়েক মাস পরেই ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে চাকরী পেয়েছে।

অমলেশ অবশ্য বলে, একমাত্র তার নিজের কৃতিত্বে এই চাকরী পেয়েছে। শ'য়ে শ'য়ে ছেলে কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষায় বসেছিল। তার মধ্যে ত্রিশজন ছেলের মাত্র চাকরী হয়েছে, অমলেশ ঐ ভাগ্যবানদেরই একজন।

বিশ্বাস হয় না। খুঁটির জোর না থাকলে তা' কিছুতেই সম্ভব নয়। খোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে অমলেশের বাবা একমাত্র মুখ্য মন্ত্রীর কাছে যাওয়া বাকি রেখেছেন। কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি যে পেছনে থেকে অমলেশের প্রতিভাকে বিকশিত করেছেন এ-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। নিজের কলমের জোরে চাকরী পেয়েছে, একেবারে বাজে কথা। কাজ হাসিল হয়ে গেলে সবাই নিজেকে এমন জাহির করে। তা'ও তাকে গোড়া থেকে না

জানলে একটা কথা ছিল। চিরদিনই অমলেশ ছিল লাস্ট বেঞ্চের খদ্দের।

মেরিটের যদি কিছু মূল্যই থাকবে তা হলে নিতাই কুণ্ডুর ছেলে সলিলের কিছু হচ্ছে না কেন? সেও তো বি. কম. পাশ করেছে এবং বেশ ভালো রেজাল্ট করেই। ভালো ছেলে হিসেবে তার যথেষ্ট সুনামও ছিল। আসলে মুরুব্বির জোর নেই, তাই কিছু হচ্ছে না। বিজ্ঞাপন দেখে দেখে দিস্তার পর দিস্তা কাগজ ধ্বংস করে দরখাস্ত পাঠিয়ে বিরক্ত হয়ে শেষ কালে বাপের সঙ্গে চানাচুর বিক্রীতেই লেগে পড়েছে। মানিয়ে নিতে পেরেছে কিনা সে-ই জানে।

অমলেশ যে খুব সুখী তা' তার কথাবার্তা থেকেই বোঝা যায়। বাপের একমাত্র ছেলে, কুমীরজলা রোডে নতুন দোতলা বাড়ি। বাবা এখনও চাকরী করেন, চাকরীস্থলে উপরি আয়ও যথেষ্ট রয়েছে। তার উপর বাড়ি থেকেও আয় হচ্ছে, নীচটা পুরোপুরিই ভাড়া দেওয়া আছে।

জীবনে সুখ আছে তাই মনেও রঙ আছে অমলেশের। সেই রঙ-এর খেলা খেলতেই প্রতিদিন নিয়ম মাফিক বাহির শ্রীরামপুর রোডে আসে। কোনো দিন সামনা সামনি পড়ে গেলে চাল মেরে কথা বলে যায়। যার মনে সুখ নেই, রঙ থাকলেও তা' আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসে। নিজের অজান্তেই তা' হয়। তাই যদি না হবে তাহলে গৌরীকে দেখলে আগের মতো মনে তেমন চঞ্চলতা জাগে না কেন? গৌরীদের ছোট বাড়িটা আগে মনে হ'তো—যেন স্বপ্নের মঞ্জিল। এখন একটা অপরাধবোধ সমস্ত সত্তাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে।

শোনা যায়, দিল্লীরোডের দু'পাশ নাকি এক সময়ে কল-কারখানায় ভরে যাবে। তার কিছু কিছু লক্ষণ অবশ্য দেখাও যাচ্ছে। অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান জমি কিনে বোর্ড লাগিয়ে রেখেছে—সাইট ফর অমুক। কোথাও কোথাও দু'চারটে কারখানা শেড-বিল্ডিং তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু প্রোডাক্শনও শুরু করে দিয়েছে। তাদের কর্মযজ্ঞ দেখলে মনে হয়—এ শুধু টাকারই খেলা। কোথা থেকে আসে এতো টাকা!

মেজদা ফাঁপিয়ে বিজনেস্ করবেন বলে হাজার পনেরো টাকা ব্যাঙ্ক থেকে লোন বের করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। শেষ কালে পনেরো হাজার টাকার জন্যে সারা গোষ্টির সম্পত্তিতে যখন নাড়াচাড়া পড়লো—মেজদা নিজের থেকেই ক্ষান্ত দিলেন।

পাড়ার ঘোষালবাবুর ব্যবসার দিকে বড় ঝোঁক। নিজে কিছু করতে না পারলেও বলতে ছাড়েন না—"তোমাদের জীবন গোলামী করতে করতেই যাবে। শেষ পর্যন্ত তা'ও মিলবে না দেখবে। দেখছো না এসব ব্যবসা বাণিজ্যের হর্তা-কর্তা-বিধাতা যারা, তাদের দেশওয়ালী ভাইয়েরা এসে কেমন বড় বড় পোষ্টগুলো দখল করে নিচ্ছে? শতকরা ষাট-পঁয়ষট্টিজন মজুরও আসছে ওদিক থেকে। এখানে পয়সা পেটাচ্ছে আর মুলুকে জমি-জিরেত করছে, দু'টোর জায়গায় চারটে মোষ হচ্ছে। আর তোমরা? নিজেদের মধ্যে দলাদলী করে ছুরি পাইপ গান নিয়ে হানাহানি করছো। বীরত্ব দেখাচ্ছ, বাহাদুরী নিচ্ছ!"

একবার কথা শুরু করলে আর থামতে চান না ভদ্রলোক। এক গাল হেসে আবার বলেছিলেন, "সে যা-ই হোক, এভাবে চাকরীর আশায় বসে থেকে আর কী করবে? তোমার মেজদার সঙ্গে ব্যবসায়ই লেগে পড়ো। ব্যাঙ্ক লোন পাক আর না-ই পাক,

মোটামুটি গুছিয়ে নিয়েছে তো ব্যবসাটা। সত্যি কথা বলতে কি, বাঙালীর ছেলেরা ব্যবসায় নামলে আমার মনে বেশ পুলক জাগে। যেন একটা আশার আলো দেখতে পাই—আমরা তাহলে শেষপর্যন্ত বেঁচেও যেতে পারি। আমার একটা ছেলে থাকলে তাকে আমি বাদামভাজা দিয়েই ব্যবসায় নামিয়ে দিতাম।"

"আর একজন আলামোহন করতে?"

"সে তুমি যা ইচ্ছে বলতে পারো।"

পাঁচ মেয়ের বাপ ঘোষালবাবুর মুখটা খুব প্রসন্ন ছিল না। যার মাথার উপরে পাঁচ-পাঁচটি আতা-ভূতো মেয়ে ঝুলছে, আজ-কালকার বাজারে তাঁর কোনোমতেই পুলকিত মনে থাকবার কথা নয়। একটা ছেলের অভাবে বুকভরা দুঃখ থাকলেও, মেয়ে পার করবার ভাবনা সেই দুঃখকে ছাপিয়ে যায়।

কথায় কথায় ঘোষালবাবু তাঁর নিজের কর্মজীবনের একটা করুণ ফিরিস্তিও দিয়েছিলেন—"কী আর বলবো তোমাকে, যেখানে এখন বলতে গেলে লটকে আছি, আগে সে-কোম্পানীটা বাঙালীর মালিকানায় ছিল। জানোই তো বাঙালীর আবার ওসবে সহ্য হয় না। তাই যা হবার হ'লো। সরিকে সরিকে বিবাদ করে অনেক মামলা মোকদ্দমার পর শেষকালে আমাদের শুদ্ধ বেঁচে দিয়ে শান্তি হ'লো। তেইশ বছর বয়সে ওখানে ঢুকেছি। তখন আমরা নাইনটি পারসেণ্ট বাঙালী কাজ করতাম। প্রাণ খুলে সাবেকি বাংলায় কথা বলতাম। একটা ঘরোয়া পরিবেশ ছিল। ম্যানেজ-মেণ্টও যেন আমাদের, শুধু আমাদের কেন, প্রত্যেকটি শ্রমিককেই নিজের পরিবারের লোকের মতো দেখতেন। কোথায় গেল সে-সব দিন! আজ অপাংক্তেয় হয়ে অফিসের একধারে পড়ে আছি। সামনে একটা টেবিল রেখেছে অবশ্য। তবে যা হাল-চাল দেখছি,

করবে না বলে বসে—বাইরে গিয়ে বসবে। কোথা থেকে কতগুলো চ্যাংড়া ছোঁড়া এনে ঢুকিয়েছে। আমি একজন পুরোনো বয়স্ক লোক—একটু মান-সম্মান দিয়ে তো চলতে হয়! ওদের নিজেদেরই নেই কোনো মান-সম্মানবোধ তা' অপরকে দেবে কী! গিয়ে একবার দেখো গে, কী সাজের ঘটা বাবুদের! গায়ে মেয়েদের মতো চকমকে জামা, হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত ঢলঢলে প্যান্ট, মাথায় বাব্‌রি আর আমাদের ছোটবেলায় যাত্রাদলের ঘাতকের যেমন জুল্‌পি দেখেছি তেমন সব জুল্‌পি। তা' ব্যাটারা বাব্‌রিই যদি রেখেছিস্, অফিসে কেন, খোল-করতাল কাঁধে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড় না! অতীষ্ঠ—অতীষ্ঠ হয়ে গেছি ওসব দেখে দেখে। নিজের পেটের জন্যে ভাবছি না, মাথার উপরে এতোগুলো পুষ্যি, তাই মাটি কামড়ে পড়ে আছি।"

ঘোষালবাবু একটু থেমে যেন দম নিয়ে ছিলেন খানিকটা।

"ওসব ছোট-খাটো চাকরী-বাকরী দিয়ে কেউ কিছু করতে পারে না। তাই বলছি, তোমার মেজদার ব্যবসাতেই ঢুকে পড়ো। দু'ভাইয়ে মিলেমিশে ব্যবসা করবে, লক্ষ্মী আপনি এসে বাঁধা পড়েছেন দেখবে।"

শেষে উপদেশের মতো করে বলেছিলেন ঘোষালবাবু, "বড়দার কথা ভুলে যেও না যেন। তাঁকে কিন্তু তোমাদেরই দেখতে হবে।"

মুহূর্তে ভেতরের কোমল তন্ত্রীতে যেন একটা মৃদু ঝংকার উঠেছিল। ঘোষালবাবুকে কী আর বলবো! কতটুকুই বা জানেন আমাদের সংসারের কথা!

মাথার উপরে জৈষ্ঠ্যের প্রচণ্ড রোদ। বাহির শ্রীরামপুর রোড

থেকে হেঁটে হেঁটে এতোদূর এসেছি। মনে হচ্ছে শরীরে আর নেই কিছু।

একটা পুলিশ ভ্যান ছুটে আসছে এদিকে। নাভির কাছ থেকে শির শিরে ঠাণ্ডা একটা তরঙ্গ উঠে বুকের ভেতরে যেন ধাক্কা মারলো। পালাবো নাকি? কিন্তু পালাবার রাস্তা কই? মাঠ দিয়ে ছুটলেও বিপদ। গুলি করতে পারে। তার চেয়ে এমনি ধরা পড়াই ভালো।

কিন্তু না। পুলিশ ভ্যানটা ভোঁ ভোঁ করে বেরিয়ে গেল। ভেতর থেকে কেউ ফিরেও তাকালো না। তাকাবে যে না একথা অবশ্য জানা ছিল। তবু পুলিশ দেখলে বুকের ভেতরে প্রথমে একটা ধাক্কা লাগে। অন্য সব চিন্তা তলিয়ে যায়।

চাকরীর উমেদারীর ফাঁকে ফাঁকে আমার রাজনৈতিক জ্ঞান চায়ের দোকানের টেবিল চাপড়ানোর মধ্য দিয়ে যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই সময়ে চাঁদু মিত্তিরের সঙ্গে আলাপ হয়। ভালো নাম চন্দ্রকান্ত মিত্র। দু'চার দিন রাজনীতি নিয়ে আলোচনার পর তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ না হয়ে পারা গেল না। সে যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করে দিলো আমি বর্তমান সমাজনীতি, অর্থনীতি আর রাজনীতির শিকার। বর্তমান অবস্থায় কোনো দেশ সুশৃঙ্খলভাবে চলতে পারে না। চাঁদু মিত্তির তারই মূর্ত প্রতিবাদ। একদিন আবিষ্কার করলাম, আমি যেন কিছুটা উগ্রপন্থী হয়ে পড়েছি। উগ্রপন্থীধারা সম্বন্ধে আমার কিছুই ধারণা নেই। কথাটা খবরের কাগজে বহুল প্রচারিত। চাঁদুর সঙ্গে মিশে কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম।

একসময়ে লক্ষ্য করলাম, বন্ধুদের কাছ থেকে আমি অনেক দূরে সরে গেছি। তারাও আমাকে এড়িয়ে চলতে চায়। কিছুটা

ভয়ও পায় যেন। গৌরীও তাই। ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। কোনো ফল হয় নি। কিন্তু রাগ করি নি ওর উপর। কেমন যেন অসহায় অসহায় মনে হ'তো নিজেকে। কেন হ'তো তা' ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারবো না। হয়তো মনের দিক থেকে সেই বহুল প্রচারিত উগ্রপন্থী হ'তে পারি নি। মাঝে মাঝে রাস্তার নিরালা জায়গায় গৌরীকে ধরতে চেষ্টা করেছি। ওকে অনেক কথা বলবার ছিল। কিন্তু গৌরীর কোনো আগ্রহ ছিল না। দেখা হ'লে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতো। রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করতাম। বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করতাম, ঠিক পথে চলেছি কিনা।

ভাবনার জালে একটা ছবি মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে। অনেক দিন আগে এক শীতের সকালে দেখেছিলাম ছবিটা। অসম্ভব রকম ভালো লেগেছিল দেখেই। কেন ভালো লেগেছিল তার বিস্তারিত কারণ হয়তো দেখাতে পারবো না। তবে ওটা যে ভালো লাগারই প্রথম বয়স! ওকি বিশ্লেষণ করে বোঝানো যায়?

ঘাসের আগায় মাকড়সার জালের মতো শিশির জমেছিল। শিশির তো কতোই ঝরে। কিন্তু সেদিনের সেই শিশির ঝরা সকাল ছবি হয়েই রয়ে গেল মনের মাঝে। অনেকদিন পর্যন্ত।

জলের ট্যাঙ্কটার কাছাকাছি ছোট একতলা বাড়িটা। খুব সাজানো-গুছানো ছিম্ ছাম্। সামনে এক ফালি জমিতে হরেক রকম ফুল ফুটেছে। গ্রীল লাগানো গেট থেকে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে বারান্দা পর্যন্ত। দরজা-জানালায় রুচিসম্মত পর্দা। সাজি হাতে ঘুরে ফিরে ফুল তুলছিল একটি কিশোরী। ওটা ওর শাড়ী পড়বার বয়স নয়, তবুও পড়েছিল। আপন মনে ফুল তুলছিল মেয়েটি। একবারও নজর পড়ছিল না গেটের বাইরে—যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। তবু বড় ভালো লেগেছিল। মনের মাঝে গেঁথে

গিয়েছিল দৃশ্যটা। গেঁথে যাওয়ার মতো এমন কী ছিল? অনেক বার প্রশ্ন করেছি নিজেকে। জীবনে এমন মুহূর্ত মাঝে মাঝে আসে যখন কিছু একটা করে বসলেও অন্য সময়ে তার কোনো যথাযথ কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

অনেক সময় গড়িয়ে গেছে সেই দৃশ্যটার উপর দিয়ে। সেই কিশোরী আজ আর কিশোরী নেই। এখন শ্রীরামপুর কলেজে বি. এ. পড়ছে।

পাড়ার দুর্গাপূজোয় মেয়েরা ফল কাটার ভার নেয়। ছ'সাত জন মেয়ে সকাল থেকে বঁটী নিয়ে বসে যায়। তাদের মধ্যে গৌরীও থাকতো। সাদা সিল্কের জমিনের উপর চওড়া লালপেড়ে শাড়ী পড়ে আসতো গৌরী। পিঠে একরাশ ভিজে চুল, আগায় ছোট গিট দেওয়া।

আমরা ছেলেরদলও ধুতি পাঞ্জাবী পড়ে মণ্ডপের কাজে হাত দিতাম। দৃষ্টি বিনিময় হতো মেয়েদের সঙ্গে। এর মধ্য দিয়েই কোন্ যাদুবলে গৌরী খুব কাছে চলে এলো।

গৌরী যে এমনিতে খুব সুন্দরী তা' নয়। তবে সুশ্রী। রঙ-টা খুব ফর্সা না হলেও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। এমন একটা কিছু ওর মধ্যে রয়েছে যেটাকে ঠিক রূপ বলা চলে না অথচ ওটার জন্যেই যেন গৌরী খুব রূপসী।

গৌরীর বাবা প্রভাত কুমার দত্ত একটা পাবলিসিটি ফার্মের আর্টিষ্ট। প্রভাতবাবুর আর কোনো সন্তান নেই। স্ত্রী-কন্যা নিয়ে তিনজন প্রাণীর সংসার—সচ্ছল, প্রাণময়। একমাত্র সন্তান বলে খুবই আদর-আব্দারের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছে গৌরী।

ওকে প্রভাতবাবুর 'আদরিণী' বললে খুব ক্ষেপে যেতো। বলতো, "আমি কি হাতির মতো দেখতে?"

"আমি কি তাই বলেছি ? তুমি প্রভাতবাবুর মেয়ে নও ?"

গৌরী আমাকে ঘায়েল করবার জন্যে মাঝে মাঝে বলতো, "যাও, তুমি আর বড় বড় কথা বলো না। দেখা মাত্রই ফ্যাকাসে হয়ে যেতে —আমি বুঝতাম না ভেবেছো ?"

হার মানতে হতো।

মৃণাল-অসীমদের কাছে বলতামও—"আমার দ্বারা ও-সব হবে না। ও-শালী সামনে এলেই বুকের ভেতর ধড়্‌ফড়্‌ শুরু হয়। ধ্যেৎ !"

চাঁদু মিত্তিরকে একদিন বলেছিলাম, "কী হবে ওসব পার্টি-পলিটিক্স করে ? জীবন থেকে যদি সুখ-শান্তিই চলে যায়, তাহলে আর রইলোটা কী ?"

চাঁদু বাঁকাভাবে হেসেছিল—"তাহলে জীবনে তোর সুখ-শান্তি ছিল বল ?"

কয়েকদিন পরেই চাঁদু একটা নামের লিষ্ট্‌ দেখিয়ে বলেছিল, "তিন নম্বর নামটা দেখছিস্—প্রাণগোপাল সাহা, শেওড়াফুলীতে থাকে। কোলকাতায় পাঁচ-দশ রকম ব্যবসা আছে। আমাদের একটা লক্ষ্মী-পার্টি।"

"লক্ষ্মী-পার্টি মানে ?"

আমি না বুঝে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

চাঁদু বুক পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে হাতে দিয়ে বলেছিল, "এটা নিয়ে যা। আজ রাত দশটায় সেখানে যাবি। ওতে পাঁচশো টাকার কথা লেখা আছে। দিয়ে দেবে। একটু

কোঁত্ কোঁত্ করে কম দিতে চাইলে মাল বের করবি, দেখবি সব ঠিক। পারবি তো ?"

চুপ করে বসেছিলাম।

"শালাদের স্বনামে বেনামে অনেক আছে, দেবে না কেন ?"

দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল চাঁদু।

সেদিনই প্রথম চাঁদুকে অপরাধী বলে মনে হয়েছিল। খবরের কাগজে প্রচারিত 'সমাজবিরোধী' কথাটার একটা জ্বলন্ত মূর্তি যেন চাঁদুর দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম। একদিন কিন্তু চাঁদুকে দেখেই মনে হয়েছিল, আমরা একটা নতুন সমাজ হয়তো গড়তে পারবো —যে সমাজে শিক্ষিত হয়েও বেকার থাকতে হবে না, যেখানে ধনী আরও ধনী হবে না, গরীবও শান্তিতে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত পাবে।

আমার সব ধারণা মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল।

চাঁদু হাতে একটা পাইপ গান নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল আর আড়চোখে দেখছিল তাকিয়ে তাকিয়ে। ঘরে যারা ছিল তাদের মুখেও কোনো কথা নেই। আমার মুখ দিয়ে কী বের হয়, হয়তো তা' শোনবার জন্যেই সবাই চুপচাপ বসেছিল্।

ঠিক সেই মুহূর্তে মনে পড়েছিল বাবার কথা। বাবা বড়দা'কে একদিন বলেছিলেন—"নিজের বিবেক থেকে যে কাজের তাগিদ পাও না তা' কখনও করতে যেও না। পরিণামে সে-কাজ ভালো হ'লে আফসোসও করো না।"

বাবার উপদেশ স্মরণ করে চাঁদুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এটা তোমার কোন্ নীতিতে পড়ে ?"

চাঁদু সজোরে নাকের উপরে একটা ঘুষি বসিয়ে দিয়েছিল। সামলাতে না পেরে মাটিতে ছিটকে পড়েছিলাম। চাঁদু গর্জন করে তার সঙ্গীসাথীদের বলেছিল, "লাথি মেরে রাস্তায় বের করে দে

শালাকে। নীতির বুলি কপ্‌চাতে এসেছে শালা! দু'দিন না খেয়ে থাকলে তোর কোন্ বাপ খাওয়াতে আসবে রে?"

আরও অনেক কথা বলেছিল চাঁদু। সব কথা কানে নেবার মতো মনের অবস্থা আমার তখন ছিল না। ভেতর থেকে একটা কান্নার চাপ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। কোনো রকমে তা' সংযত করে রাস্তায় নেমে এসেছিলাম। চাঁদুর দলের কানা বলাই এসে আবার ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। দরজার সামনে যেতেই চাঁদুর গলা শোনা গেল—"ওকে বলে দে, থানা-পুলিশ যেন না করে।"

চাঁদুর দল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। বলতে হবে খুব সহজভাবেই।

সেদিন রাত্রিতেই পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করেছিল। হাজত-বাসও করতে হয়েছিল একরাত্রি। বড়দার বন্ধু হীরেনদার থানায় একটু হাত আছে। তাঁর চেষ্টায়ই এই থানা-পুলিশ ব্যাপারটার একেবারে নিষ্পত্তি হয়েছে।

হীরেনদা নাকি থানার ছোটবাবুকে অনুরোধ করে বলেছিলেন, "ছেলেটা ভালো হ'তে চায়, একবার সুযোগ দিয়ে দেখুন, স্যার।"

ছোটবাবু বলেছিলেন, "আপনি যখন বলছেন, তাই হবে। ছেলেগুলো ভালো হোক্ এটাই তো আমরা চাই। এদের পেছনে ছুটে ছুটে আমরাই কি খুব সুখে আছি?"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, স্যার। আমার নিজের দায়িত্বে রাখবো।"

বড়দা একদিন কত বুঝিয়েছেন—"ওসব ছেড়ে দে, তরুণ। জেনে রাখ এর জন্যে একদিন দুঃখ পাবি।"

সেদিন বড়দার কথা শুনি নি। দুঃখ তো আমি অনেক

পেয়েছি।

মেজদা রাগারাগি করেছেন—“বাড়ি থেকে দূর করে দাও। নয়তো পুলিশ ডেকে হাজতে পাঠাও। তোমাদের ঐ নরম কথায় কিছু হবে না।”

বরাবরই মেজদা একটু রগচটা গোছের মানুষ।

বৌদিও অনেক বুঝাতেন—“ওসব করে কী লাভ আছে, ছোটঠাকুরপো? এমনভাবে কে কবে রামরাজত্বি ফেরাতে পেরেছে? একদিন তোমার কাছেই সব মিথ্যে বলে মনে হবে।”

মনে মনে বলেছি—আমি নিজেই মিথ্যে হয়ে গেছি বৌদি। আমাকে এখন আর কেউ চায় না। গৌরীও না।

গৌরীর কাছে গিয়ে নিজের ভেতরটা একেবারে খুলে দেখাতে ইচ্ছে হয়েছে। গৌরী, আমাকে ভুল বুঝো না। আমার মতো অনেকেই তো গেছে একটা বিরাট প্রেরণা নিয়ে। বলতে চাও তারা সবাই ভুল করেছে? সে-বিচার করবার ক্ষমতা আমার কিন্তু নেই। হয়তো কারো পক্ষেই তা' সম্ভব নয়। একজনের কাছে যেটা অসত্য, অন্যের কাছে তা' পরম সত্য বলে মনে হ'তে পারে। তুমি বিশ্বাস করো, যেদিন চাঁদুর আসল রূপটি দেখেছিলাম, সেদিনই—সে-মূহূর্তেই মনে হয়েছিল—এ আমি কোথায় এসেছি! যা চেয়েছিলাম, এ তো তা' নয়! যে বিশ্বাস নিয়ে গিয়েছিলাম সেটা সত্যিও হতে পারে, মিথ্যে হলেও আজ আর আমার কোনো ক্ষোভ নেই। আমি আজ নিঃস্ব হয়ে গেছি, গৌরী। সমাজ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বসেছি। এ সরল সত্যটাকে আজ স্বীকার না করে উপায় নেই। এতো ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছি যে নিজেকে হাল্কা করতে না পারলে কিছুতেই আর স্বস্তি পাচ্ছি না। তুমি আজ কী বলবে জানি না। তবে বিশ্বাস করো গৌরী,

নিজের নীতিবোধকে আমি কোনোদিন বিসর্জন দিই নি। আমি সমাজবিরোধী নই। আমি সবাইকে ভালোবাসতে চেয়েছিলাম, দেশকে ভালোবাসতে গিয়েছিলাম। পরিণামে ফিরে এলাম এক-মাথা কলংক নিয়ে। কিন্তু তাই বলে তুমিও কি আমাকে কলংকিত ভেবে ছোট করে রাখবে!

পারি নি। একথা গৌরীকে কোনোদিন বলতে পারি নি। গৌরী এক মূহূর্তও সময় দেয় নি। ও আমার কোনো কথাই শুনতে রাজি ছিল না। আহত হয়ে ফিরে এসেছিলাম। বুকের ভেতরটা গুড়িয়ে গেলেও নিজেকে সংযত রেখেছি। এমনভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়া পৌরুষের পক্ষে কতটা অপমানকর সে-বোধ প্রখরভাবেই মনের মাঝে কাজ করছিল। কী জানি কেন, গৌরীর উপর কোনোদিনই রাগ করতে পারতাম না।

কারখানার গেটের সামনে বালি বোঝাই একটা লরী কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকের চাকা ফেঁসে গেছে বোধ হয়। একজন খালাসীগোছের ছোকরা একাই মেরামতির তোড়জোড় করছে। লরীটা এমনভাবে রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে যে আর কোনো গাড়ী সে-রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা একেবারে অসম্ভব। দারোয়ান খৈনি ডলতে ডলতে এসে ড্রাইবারকে গোটাকয়েক খিটখিটে কথা বলে চলে গেল। মনে হ'লো না ড্রাইবার তার একটি কথাও কানে তুলেছে। দারোয়ান চলে যেতে সে লরী থেকে নেমে এসে খালাসী ছোকরাটাকে একটা খিস্তি দিয়ে বললো, "জকটা ফিট করতে শালা সারাদিন কাটিয়ে দিলে।"

"তুমি হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছ, একা একা কি পারা যায় ?"

জ্যাকের নীচে একটা তক্তা ঢুকাতে ঢুকাতে খালাসী ছোকরা বললো।

ড্রাইভার তাকে আরেক দফা গালাগাল দিয়ে নিজে হাত লাগাল।

একটু দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে। পেছন থেকে কে ঘাড়ের উপরে হাত রাখলো। ফিরে দেখলাম চাঁত্বর দলের কানাবলাই।

"কী রে, কোথায় যাচ্ছিস ?"

বলাই তার ভালো চোখটা মিটমিট করে জিজ্ঞেস করলো।

ইচ্ছে হচ্ছিল না কিছু বলতে। তাই কয়েক মুহূর্ত চুপ করেই রইলাম।

"চাকরির জন্যে এসেছিস ?" মুখ বাঁকিয়ে হাসলো বলাই। "কোনো লাভ হবে না। চাঁত্বকে ধর। চাকরির ব্যাপারে সে-ই এখানে সব। এই যে বালির গাড়ি দেখছিস, এও তারই। চুন-সুরকি-ইট-বালি সাপ্লাই করে। নাকের গোড়ায় এসে ফেঁসে গিয়ে কী ঝামেলায় ফেলেছে ছাখ্ দেখি! চাকার আর দোষ কী! শালা পট্টি ঠেসে ঠেসে ওর আর রেখেছে কিছু ?"

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ড্রাইভার আর খালাসীর কাজ দেখছি। জ্যাক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লরীটাকে অনেকটা সোজা করে ফেলেছে ততক্ষণে।

বলাই বললো, "চাঁত্ব ভেতরে আছে, চল্ যাই। ও সায়েবের কাছে নিয়ে গেলে তোর চাকরি কোন্ শালা আটকায় ? যাবি ?"

দৃঢ়স্বরে বললাম, "না।"

আমার কথা দিয়ে শুরু করলেও পুরোটাই কিন্তু আমার কথা নয়। এ-কাহিনীর মধ্যে যাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাঁরা হলেন আমার বড়দা আর বৌদি। রাম-সীতাকে বাদ দিয়ে যেমন একক লক্ষ্মণকে ভাবা যায় না, তেমনি বড়দা-বৌদিকে ছাড়া আমার কোনো কথারই পূর্ণতা আসবে না।

বড়দা হাওড়ায় একটা বড় লোহার কারখানায় চাকরি করতেন। ফাউণ্ড্রী ডিভিশনে। বেতনও ভালো পেতেন। যখনকার কথা, মেজদা তখন সবে বি. এস্-সি. পাশ করে চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছেন। বাবাও রিটায়ার করেছেন মেজদা পাশ করবার মাস তিনেক আগে। একমাত্র বড়দার উপরই চলছিল পুরো সংসারটা।

আগের টালির চালা ভেঙ্গে বাড়িটাকে নতুন করে খাড়া করতে বাবার কিছু ধারদেনা হয়েছিল। ম্যাচিওর হওয়া একটা

লাইফ-ইন্সুরেন্সের দশ হাজার টাকা যোগ দিয়েও কুলোয় নি। বড়দার বেতন থেকে কিছুটা চলে যেতো ঐ দেনা শোধের জন্যে।

মেজদাকে বড়দা ব্যবসা করতে উৎসাহ দিতেন। যে কোনো অর্ডার সাপ্লাইং এর ব্যবসা। কিন্তু ব্যবসার চেয়ে চাকরিতেই মেজদার বেশী উৎসাহ ছিল। ধরা-বাঁধা নিয়ম মাফিক কাজ। কোনো ঝামেলা নেই। অফিস থেকে বেরোনোর পরই সব দায়িত্ব শেষ। সময় মতো চাকরি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন মেজদা।

প্রশ্ন উঠেছিল— টাকা? সে-ও বড়দাই দিয়েছেন। মায়ের নামে বাবা পোস্ট-অফিসে কিছু টাকা রেখেছিলেন। সে-গুলোও তোলা হলো। তারপর বৌদির কিছু গয়নাও গেল সেকরার দোকানে। এতোগুলো সোর্স্ থেকে মেজদার বিজনেস ক্যাপিটেল এসেছিল।

স্পেয়ার পার্টস দিয়ে মেজদার বিজনেস প্রথমে শুরু হয়েছিল। ঘুরে ঘুরে কোনো মিডিল-ম্যান, কখনও ডাইরেক্ট কোনো কোম্পানীর অর্ডার নিয়ে আসতেন মেজদা। হাওড়া-লিলুয়ার গোটাকয়েক কটেজ ইণ্ডাস্ট্রির সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছিল। সেসব জায়গা থেকে মাল করিয়ে সাপ্লাই দেওয়া হতো। আবার কখনও কখনও ড্রয়িং অনুযায়ী বড়দার কারখানায় কিছু কিছু মাল কাস্টিং করতে হতো। বড়দা আছেন, তাই ডেলিভারি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিল মেটানোর কোনো প্রশ্ন উঠতো না। পরোক্ষভাবে এখানেও কিছু ক্যাপিটেল পেয়ে গেলেন মেজদা। কোনোদিক দিয়েই তাকে খুব একটা বেগ পেতে হয় নি। কাজকর্ম নিয়ে মাথাও খাটাতে হয় নি। যারা মেশিনে কাজ করে তারাই ড্রয়িং দেখে মাপ-জোখ করতে ওস্তাদ। তবুও বড়দার তাগিদে কিছুদিন এ-লাইনের বইপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া

করেছিলেন।

এখন তো মেজদার ব্যবসা বেশ ভালোই চলেছে। নেতাজী সুভাষ রোডে কোন্ এক বন্ধুর অফিসে আশি টাকা ভাড়ায় একখানা টেবিল নিয়েছেন। নেতাজী সুভাষ রোডে এ-টাকা কিছুই নয়। অনেক ভাগ্যের জোরে বিনা সেলামীতে টেবিলটা পাওয়া গেছে। বন্দোবস্ত করবার আগে বড়দাকে অবশ্য বলেছিলেন, "কোলকাতায় অফিস না হলে ব্যবসায় কদর বাড়ে না। নিয়ে নিই টেবিলটা। কী বলো তুমি?"

"নিলে তো ভালোই হয়। কিন্তু চালাতে পারবি তো?"

মেজদার কপালটা ভালো। এ-অফিসটা ছেড়ে দিয়ে ব্রেবোর্ণ রোডে গোটা একটা ঘর নেবার তাল কষছেন। একটা মোটর-বাইকও নাকি কেনবার ইচ্ছে আছে।

মোটর-বাইকের কথা শুনে বড়দা শাসিয়েছেন—"দেখ, ওটা করলে কিন্তু আমি হাঙ্গার-স্ট্রাইক করবো। ও হলো মরণের কল। ওসব নেশা ছাড়। যেদিন পারবি হিন্দমোটরের একটা গাড়ি কিনে নিস্, আপত্তি করবো না।"

বেচারা বড়দা! কথাটা তাঁর বিফলেই গেল।

ইনস্টলমেণ্টে মেজদা একদিন মোটর-বাইক কিনে নিয়ে এলেন।

"কিনেই ফেললাম, বড়দা। দিন দিন দাম শুধু বেড়েই চলেছে। চার বছর পর বিক্রি করলে ঐ একই দাম পাবো।"

"ভালোই করেছিস।"

ছোট করে বলেছিলেন বড়দা। দুঃখটা হজম করে নিয়েছিলেন।

মেজদা বরাবরই একটু অবাধ্য। কিছুটা স্বার্থপরও। নিজের

ইচ্ছেটাই তাঁর কাছে সব। কোনো কাজ করবার আগে একবারও ভেবে দেখেন না—ব্যাপারটা কে কী ভাবে নেবে। একান্নবর্তী পরিবারে থাকতে গেলে সবাইকে সবার মন বুঝে চলতে হয়। যারা চলে না, তাদের ভেতর দিয়েই অশান্তির বীজ আসে। মেজদার কার্যকলাপ দেখলেও বোঝা যায় সংসারের অনুশাসন থেকে তাঁর নিজের ইচ্ছেটাই সবচেয়ে বড়।

বাবা গোড়া থেকেই মেজদার এই স্বভাবের জন্যে মনে মনে বিরক্ত। মেজদাও তা বোঝতেন। তাই বাবাকে সাধ্যমত এড়িয়ে চলতেন। মোটর-বাইক ঘরে তোলার পর অবশ্য একবার কৈফিয়তের ভঙ্গীতে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

বাবা বলেছিলেন, "আমি বেশী কিছু বলতে চাই না। তবে ওটা না কিনলেই সুখী হতাম। অরুণ নাকি তোমাকে নিষেধও করেছিল। চিন্তা করে দেখো, তার কথাটা অন্ততঃ তোমার রাখা উচিত ছিল কিনা।"

কিন্তু মোটর-বাইক দিয়ে আমাদের সংসারে সর্বনাশ এলো না। এলো অন্য রাস্তায়, যা বাড়ির কেউ কোনোদিন কল্পনাও করেন নি। একদিন ডিউটি সেরে ফেরবার পথে ট্রেন থেকে পড়ে গেলেন বড়দা। ভাগ্যের জোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। দুর্ঘটনার খবর বাড়িতে পৌঁছুতেই মা পাগলের মতো হয়ে গেলেন। বাবার প্রেসার বেড়ে গেল। বৌদি মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

পরদিন ২৪ পরগণার রাজীবপুর আশ্রম থেকে বাবার গুরুদেব শ্রীশ্রীপাগল যোগানন্দ বাবা এলেন। এ-সময়ে গুরুদেবের আসবার কোনো কথা ছিল না। বড়দার চিকিৎসা নিয়ে আত্মীয়স্বজনসহ সবাই ব্যস্ত থাকায় রাজীবপুরে গিয়ে সংবাদটাও দেওয়া সম্ভব

হয় নি। শুনেছি, শিষ্যের দুঃখের কথা কোনো গুরুর কাছেই অজানা থাকে না। এমন দুঃসময়ে অভাবনীয় ভাবে গুরুদেবকে কাছে পেয়ে বাবা যেন অকূল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে একটা বিরাট দ্বীপের সন্ধান পেলেন।

বাবা গুরুদেবকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "জীবনে আমি কোনোদিন কারো অমঙ্গল কামনা করি নি, বাবা। তবে আমার এই শাস্তি কেন?"

মা কিছুই বলতে পারেন নি। গুরুদেবের পা দু'টি জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

"ওঠো মা, বিপদে অধীর হতে নেই।"

বলে গুরুদেব বাবার দিকে তাকালেন। "তোমাদের অনেক পুণ্যফলে ছেলেকে তোমরা প্রাণে ফিরে পেয়েছো। যেটুকু হারিয়েছো—জানবে, তা তোমাদের ভাগ্যেই লেখা ছিল।"

মা'র মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে আবার বললেন গুরুদেব, "ভাগ্যের লিখন তো খণ্ডন করা যায় না, মা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাদের সখা ছিলেন, সেই পাণ্ডবেরাও তো দুঃখ-কষ্টের উর্ধ্বে যেতে পারেন নি। দুঃখকে বরণ করেই তাঁরা দুঃখকে জয় করেছিলেন। যদুপতি পারেন নি তাঁদের সেই দুঃখ থেকে আড়াল করে রাখতে।"

নানারকম উপমা দিয়ে গুরুদেব বাবা ও মাকে শান্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু সংসারী মানুষ জাগতিক চিন্তা-ভাবনার উর্ধ্বে উঠতে পারে না। মা-বাবাও পারেন নি।

কিছুদিন পরে বড়দা যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন তখন তাঁর নিত্যসঙ্গী হলো দু'টি ক্রাচ। ডান পা-টা হাঁটু থেকে বাদ দিতে হয়েছে। মনে আছে, ক্রাচে ভর দিয়ে বড়দা যেদিন

বাবার সামনে প্রথম এসে দাঁড়িয়েছিলেন—সে এক করুণ দৃশ্য। বাবা, মা, বৌদি সবাই কাঁদছেন। বড়দাই সান্ত্বনা দিয়েছেন সবাইকে।

"তোমরা এভাবে কান্নাকাটি করে আমার মনের জোরকে কমিয়ে দিও না, মা। আমি তো বেশ ভালো'ই আছি। প্রাণে তো বেঁচে গেছি। এতোদিন সাধারণভাবে হাঁটতাম, এখন না হয় একটা কিছু অবলম্বন করে হাঁটবো। আমার মতো এমন কত লোক আছে।"

বলতে বলতে নিজেও চোখের জল লুকিয়েছিলেন বড়দা। মা তাঁর মাথাটি বুকের মধ্যে স্বস্নেহে চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন—"কোন্ পাপে ভগবান আমাকে এ-শাস্তি দিলেন বাবা! চাঁদে কলংক আছে, আমার সোনারচাঁদ ছেলের তাও ছিল না—ওরে কী বলে আমি মনকে বোঝাবো।"—

সবার বুকের মধ্যে শেলের মতো বিঁধেছিল ঘটনাটা।

কিছুদিন পরে বড়দার চাকরি গেল। বড়দা থাকতে যাদের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত হচ্ছিল তাদের তদারকীতেই চাকরিটা খুব তাড়াতাড়ি গেল। বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বাড়িতে স্থায়ী উপার্জনের আর কেউ নেই। মেজদার কাজে বাবা ভরসা করতে পারেন নি। তাছাড়া মেজো ছেলে যে প্রয়োজনে সবাইকে দেখবে এমন একটা বিশ্বাস বাবার একেবারেই ছিল না।

বড়দা ছিলেন বাবার ডান হাত। অত্যধিক বাধ্য। কোনো কাজ করবার আগে বড়দার সঙ্গে পরামর্শ না করে করতেন না। বড়দার দুর্ঘটনাজনিত আঘাতটা বাবা যতদিন জীবিত ছিলেন সামলাতে পারেন নি।

অনেক হাঁটাহাঁটি করে ভাণ্ডারহাটির কাছে একটা স্কুলে কাজ

পেয়েছিলেন বড়দা। তারকেশ্বর লাইনে হরিপালে নেমে যেতে হয়। বেতন সামান্য। যা মিলবে, সই করতে হবে তার দ্বিগুণে।

মাথার উপরে অনেক দায়িত্ব। বৌদি আর বছর দু'য়েকের ছেলে রাজা—তাদের ভবিষ্যৎ আছে। রয়েছেন বাবা-মা। রয়েছি আমি আর মেজদা। সবাইকে নিয়ে সুষ্ঠভাবে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব যারা পালন করেন তাদের সংখ্যা সংসারে আজকাল খুব বেশী নেই। সামান্যসংখ্যক যারা আছেন তাদের মধ্যে আমার বড়দার একটি উজ্জ্বল স্থান রয়েছে।

বাবা বড়দাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, "বুঝি, কাজটাকে তুমি কিছুতেই মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারছো না। কষ্ট হচ্ছে, হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কী করবে—ভবিতব্যকে মেনে নাও। আমরা জানি, শিক্ষকের জীবন একটা আদর্শময় জীবন। কিন্তু আর্থিক দিকের কথা ভেবে আমরা সে-জীবন অনেকেই গ্রহণ করতে চাই না। আমি তোমার উপর এখনো অনেক আশা রাখি, অরুণ। আমি বিশ্বাস করি, তোমার কর্ম দিয়ে তুমি তোমার অভীষ্টে পৌঁছে যাবেই।"

ব্যর্থ হয়েছে বড়দার সকল প্রচেষ্টা। ওই কম মাইনের মাস্টারী থেকে বড়দার আর কিছুই হয় নি আজ পর্যন্ত।

একটা গভীর মর্মবেদনা নিয়ে বাবা মারা গেলেন। বড়দাই ছিলেন বাবার আলোক-বর্তিকা। সেই আলো যেদিন স্তিমিত হয়ে গেল সেদিন থেকেই বাবার জীবনের পথেও বুঝি অনেক অন্ধকার নেমে এসেছিল। একদিন খেতে বসে ভাত মেখে সবে মুখে গ্রাস তুলতে যাবেন—সেই মুহূর্তে বাবার সমস্ত চেতনা স্তব্ধ হয়ে গেল। পাতের ভাত পাতেই পড়ে রইলো, ডাক্তার ডাকারও সময় দিলেন না। অস্ফুটে কেবলমাত্র একবার গুরুদেব শ্রীশ্রীপাগল যোগানন্দ

বাবার নাম উচ্চারণ করেছিলেন

সংসার বাঁচাতে বৌদি নিজে চাকরি করবেন—বাবা বেঁচে থাকলে একথা স্বপ্নেও ভাবা যেতো না। বাবা মারা যাবার পরই বৌদি চাকরির জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। বিয়ের আগে কলেজে পড়বার সময় 'টাইপ' শিখেছিলেন। সেই শেখাটা যে এভাবে কাজে লাগবে তা কে জানতো।

বড়দা অমত করেছিলেন—"না স্নমি, তা হয় না। তুমি চাকরি করতে বেরোবে—এ আমি চিন্তাও করতে পারি না। কী অভাব তোমার?"

"তুমি তা বুঝবে না।"

অস্ফুট বলেছিলেন বৌদি।

"বুঝবো না? কেন?"

বৌদি উত্তর না দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন।

"বুঝবো না কেন, স্নমি? কী বলতে চাও আমাকে খুলে বলো।"

বৌদির দিক থেকে সরাসরি কোনো জবাব আসে নি।

বড়দা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেছিলেন, "বরুণ আছে, আমিও কিছু কিছু পাচ্ছি—সংসার না চলবার মতো তো কোনো কারণ দেখি না। আজ না হোক দু'দিন বাদে তরুণও কিছু একটা নিশ্চয়ই করবে। এতো ভাবনার কী আছে? আজ যদি তুমি চাকরি করতে বেরোও, বরুণ মনে মনে ভাববে না তার উপর হয়তো আমরা বিশ্বাস রাখতে পারছি না?"

বৌদির চোখ দু'টি জলে চিক্‌চিক্ করছিল। বড়দাকে শুধু কাতর অনুনয় করেছিলেন, "লক্ষ্মীটি, তুমি অমত করো না।"

"আমার মতামতই এখানে সব নয়, স্নমি। মা আছেন। মাকে রাজি করাতে পারবে?"

"চেষ্টা করবো।"

"আমার মনে হয় পারবে না। বাবাকে তো তুমি ভালো-ভাবেই জানতে। বাবার আদর্শ সব সময়ই মা সাধ্যমত মেনে চলতে চেষ্টা করেন। বাবা বেঁচে থাকলে তুমি কিন্তু চাকরির কথা মুখেও আনতে পারতে না।"

মার কানে কথাটা উঠতে তিনিও বাধা দিয়ে বলেছিলেন, "তা হয় না, বৌমা। আমাদের বংশে ঘরের বৌ-মেয়েরা কোনোদিন অফিস-কাছারিতে বেরোয় নি। ভবিষ্যতে কোনোদিন বেরোবে সে-আশাও করি না। এটা আমাদের সংসারের একটা নীতিই বলতে পারো।"

"সময়বোধে নীতিও পাল্টাতে হয়, মা। নীতি বাঁচাতে

গিয়ে সংসারই যদি ডুবে যায়, রাজা যদি ঠিকমত মানুষ হবার সুযোগ না পায় তাহলে সেই নীতিকে আঁকড়ে ধরে লাভ কী ?"

মা যেন একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ওকথা বলছো কেন, বৌমা ? বরুণ রয়েছে, তরুণ রয়েছে—ওরা কি তোমার কেউ নয় ? ওরা থাকতে সংসার ডুবে যাবে, রাজা অমানুষ হবে—একথা ভাবলে কেমন করে ?"

"আপনি আমার গুরুজন, অপরাধ নেবেন না, মা। সংসারের আপনি দেখেছেনও আমার চেয়ে অনেক বেশী। তবু বলবো—আপনার চোখ দিয়ে সেই দেখার দিন আজ আর নেই।"

শুনে মা কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে কী ভেবেছিলেন; কোনো কথা বলেন নি।

বৌদির চাকরি নিয়ে যে সমস্ত বাদানুবাদ হয়েছে তার কোনো কিছুই মেজদার অজানা ছিল না। অথচ নিজের থেকে এ-ব্যাপারে একেবারেই মুখ খোলেন নি। মা গিয়ে বলেছিলেন, "তোর বৌদিকে বুঝিয়ে বল, বরুণ। অরুণও অনেক বলেছে, কিন্তু তার ঐ এক গোঁ—চাকরি করবেই।"

"আমি বললে কী হবে ? শোনবেন ? বড়দা যেখানে পারলেন না।"

"বলে তো দেখতে পারিস।"

"কোনো লাভ নেই, মা। তাছাড়া তোমার বৌমা নাবালিকা নন। নিজের ভালো-মন্দটা তিনি বুঝতে শিখেছেন।"

"এভাবে কথা বলছিস কেন ?"

মা'র গলায় কিছুটা উত্তাপ। একটু অপ্রস্তুতও হয়েছিলেন যেন। মেজদার কথার তাৎপর্যটা তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন হয়তো। কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু না বলে খুব সহজ

সরলভাবে শুধু বলেছিলেন, "নাবালিকা নয় বলেই যা খুশী তাই করবে আর তোরা চেয়ে চেয়ে তাই দেখবি ?"

"আমার কথা বাদ দাও।"

শুকনো গলায় বলেছিলেন মেজদা।

মা কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলেছিলেন, "আমার আর কিছুই বুঝতে বাকি নেই, বরুণ। বৌমাও ঠিকই ভেবেছিল।"

মেজদা নিজেকে আড়াল করবার জন্যে সহজ হতে চেষ্টা করেছিলেন। ভেতরটা এতো সহজে মা দেখে ফেলবেন এটা হয়তো ভাবতে পারেন নি। পরিবেশটা একটু হালকা করবার জন্যে সাবলীলভাবে বলেছিলেন, "বাবা মেয়েদের এ সমস্ত চাকরি-বাকরি করা পছন্দ করতেন না জানি। কিন্তু বাবার দিনকাল কি আজ আর আছে, মা ? কোনো কিছুতেই আজকাল আর দোষ হয় না। যার যা ইচ্ছে তাকে তাই করতে দাও।"

"আমি বেঁচে থাকতে তা কিছুতেই হবে না।"

মা'র গলার স্বরে অসম্ভব দৃঢ়তা ছিল।

"বড় ভুল করছো, মা।"

"জানি। তুই বলবি কেন—হয়তো সবাই বলবে। কাজটার জন্যে একদিন আপসোস হবে তাও বুঝতে পারছি।"

শেষের কথাটা শুনে মেজদা সামান্য তির্যকভাবে তাকিয়েছিলেন মা'র দিকে।

"তবে আজ এতো আপত্তি কেন ?"

মা খুব প্রসারিত দৃষ্টি মেলে মেজদার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইছিস যা, কিন্তু তোর বাবার নীতিকে অমর্যাদা করিস কোন্ সাহসে ?"

জোঁকের মুখে নুনের ছিটে পড়লে যে-রকম অবস্থা হয়

মেজদারও তাই হয়েছিল। কিন্তু এক মুহূর্তে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে বলেছিলেন, "অনেক কিছুই দেখছি বুঝে নিয়েছো ?"

"এ-বোঝার মধ্যে কি কোনো ভুল আছে, বরুণ ?"

"সে তোমরাই জানো। তবে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে এতো সহজে এতো অল্প সময়ে এতো বড় একটা ধারণা তোমরা করলে কেমন করে।"

"তোর কথা-বার্তা চাল-চলন কি তাই প্রমাণ করে যে ধারণাটা খুব সহজে হয়েছে ?"

মা'র কাছ থেকে সেদিনই চাকরি করবার অনুমতি পেয়েছিলেন বৌদি। তারপর দেখেছি বাবার ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে মাকে চোখের জল ফেলতে। এ চোখের জলের অর্থ আমার না বোঝবার কথা নয়।

মা'র অনুমতি পেলেও চাকরি পাওয়া সহজ ছিল না। বছর-খানেক ঘোরাঘুরিই সার হলো। দরখাস্তের সঙ্গে লট্‌কানো প্রধান শিক্ষক-অধ্যাপক-গেজেটেড অফিসার আর পৌরপিতার কথা বাদই দিলাম, এম-এল-এ পর্যন্ত যখন বাতিল হয়ে গেল তখন চাকরির আশা ছেড়েই দিলেন বৌদি।

বৌদির পিসতুতো দাদা রমেশবাবু একদিন বড়দার সঙ্গে কী একটা পরামর্শ করতে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি নামকরা একটা বেসরকারী ফার্মের বিল-বাবু। বৌদি কথায় কথায় তাঁকে নিজের মনোবাসনাটা জানালেন। জানতে চাইলেন একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন কিনা।

রমেশবাবু বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, "তুই চাকরি করবি— ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না তো !"

"কেন, দোষ আছে কিছু ? আজকাল তো অনেক মেয়েরাই

করছে।"

"তা করছে। কিন্তু তোর তো চাকরি করবার কথা নয়—তুই করবি কেন ?"

"প্রশ্নটা খুব কঠিন।"

"কঠিন মানে ?"

"সব সময় সবকিছুর জবাব খুব স্পষ্ট করে দেয়া যায় না, দাদা। তবে তুমি এ-টুকু জেনে রাখো, আমার একটা চাকরির খুবই দরকার।"

"অরুণের সঙ্গে ঝগড়া করিস নি তো ?"

রমেশবাবু কিঞ্চিৎ সহজভাবে দেখতে চেষ্টা করেছিলেন ব্যাপারটা।

"ঝগড়া করবো কেন ?"

"জিজ্ঞেস করছি।"

"ওসব কিছুই হয় নি।"

"অরুণ রাজি আছে ?"

"আপত্তি খুব একটা নেই।"

"আশ্চর্য !"

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন রমেশবাবু। শেষে বলে-ছিলেন, "আমি চেষ্টা করবো।"

রমেশবাবুর চেষ্টায়ই বৌদির চাকরি হয়েছিল। বৌদি ভাবতেই পারেন নি এতো সহজে তিনি একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে পারবেন। একজন বিল-বাবুর কথার এমন কোনো ওজন থাকে না যা শুনে চাকরি দেওয়ার কেষ্ট-বিষ্টুরা তার কথা শিরোধার্য করে নিতে পারেন। তবুও এক জায়গায় প্রভাব খাটিয়েছিলেন তিনি। সেটা আগরওয়াল এণ্ড কোম্পানীর বিজয়

আগরওয়ালের কাছে। মিস্টার আগরওয়ালের রিফ্রেক্টরী মেটি-রিয়্যাল্ সাপ্লাইং-এর ব্যবসা। সময় মত বিল আদায়ের জন্যে মাঝে-মধ্যে একটু-অ'ধটু ভালোবাসতে হয় বিল-বাবুকে। বিল-বাবুও সুযোগ বুঝে এই সুযোগটাই নিলেন। অবশ্য আগরওয়াল সায়েবের একজন লেডি-টাইপিস্টের দরকারও ছিল, বলাই বাহুল্য তা অবিবাহিতা। কিন্তু বিল-বাবুর অনুরোধটা শেষ পর্যন্ত না রেখে পারেন নি। পরে অবশ্য কেণ্ডিডেটকে দেখে খুশীই হয়েছিলেন আগরওয়াল সাহেব।

অ্যাপয়েন্ট্মেন্ট্ লেটারটা রমেশবাবু নিজেই হাতে করে নিয়ে এসেছিলেন। বৌদির হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, "সুমি, দুঃখ আর আনন্দ আজ আমি দুই-ই পেলাম।"

বৌদি হাসতে চেষ্টা করেছিলেন। পারেন নি। তারপর বন্ধ ঘরে বিছানায় মুখ লুকিয়ে তাঁকে কাঁদতে দেখেছি। অত্যধিক আনন্দ হলে যা হয়—এ সেই কান্না নয়। চাকরির অনুমতি দিয়ে মা চোখের জল ফেলেছিলেন, তার অর্থ যেমন বুঝেছিলাম, চাকরি পেয়ে বৌদির এই কান্নার অর্থও না বোঝবার মতো কঠিন ছিল না।

রাজাকে মা'র হাতে গছিয়ে দিয়ে বড়দা আর বৌদি সকাল ন'টায় এক সঙ্গেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। একজনের তারকেশ্বর লাইন, অপরজনের হাওড়া। উভয়েই উভয়কে সতর্ক করে দেন—"সাবধানে যেও।"

বৌদি সংসারের জন্যে চাকরি করছেন—এ-ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। কোনো রকমে যে-কোনোও একটা কাজ পেলেই তাঁকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে এনে ঘরে বসাবো। ঘরের বৌয়েরা ঘর না দেখলে সংসারে লক্ষ্মী থাকে না। যে রাজাকে ঠিক মতো মানুষ করবার জন্যে বৌদির এতো কষ্ট-স্বীকার,

সে-ও শেষ পর্যন্ত হয়তো অমানুষ হয়ে যাবে। মাতৃস্নেহ ছোটদের একটা বিরাট মূলধন। ওদের মানসিকতায় মাতৃস্নেহের প্রভাব না থাকলে মনটা ঠিক মতো তৈরি হয় না। বৌদি সারাদিন বাইরে থাকেন, রাজা কতটুকু স্নেহ পায় তাঁর কাছ থেকে? একদিন দেখা যাবে, রাজার মনটাও অনেকটা শুকিয়ে গেছে, মনের সেই কমনীয়তা আর নেই, সবকিছুতেই একটা ছাড়া ছাড়া ভাব—ঐ মেজদার মতো।

ঘরের বৌ-মেয়েরা ঘর-সংসার ফেলে চাকরিতে বেরোবে—এটা ছিল বাবার চক্ষুশূল। মেয়েদের এই অবাধ গতি দেখে বাবা একদিন মাকে বলেছিলেন, "এই হচ্ছে সমাজ-সংসার ধ্বংসের সূচনা। মেয়েরা গৃহকোণ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলে সমাজ-সংসারের বাহ্যিক উন্নতি হয় সত্য কিন্তু ভেতরটা একেবারে অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়ে। প্রাচীনকালের মনীষীরা যে বিধান দিয়ে গেছেন তা অনেক ভেবে-চিন্তেই দিয়েছেন। এই ধরো না বিদেশের মেয়েরা, জীবনের সার্থকতা ওরা ঘরের বাইরে খুঁজতে যায়, তাই আজ ওদের আধুনিক সভ্যতায় এতো জটিলতা।"

যে-মানুষের মানসিকতা এই ছিল, তাঁরই পুত্রবধূ আজ বেরিয়েছে দশটা-পাঁচটা অফিস করতে।

বিধাতার বিধান খণ্ডাবে কে!

বৌদির চাকরি পাবার কিছুদিন পর মেজদা মা'র কাছে নিজেই তাঁর বিয়ের ব্যাপারে কথা বলেছিলেন। পাত্রী ব্রাহ্মণ। নাম জয়শ্রী চ্যাটার্জি, এক বন্ধুর বোন। কোন্নগরে বাড়ি। বড়দা যখন দু'এক জায়গায় পাত্রী দেখেছিলেন তখন মেজদা কেন বিয়ে করতে অমত করেছিলেন সেদিন তা বোঝা গিয়েছিল।

মেজদার কথা শুনে মা অন্নজল ত্যাগ করলেন। বড়দা খুব বেশী কথা বলেন নি। কতটা আঘাত পেয়েছিলেন বাড়ির কাউকে বুঝতেও দেন নি। দেখা গেছে, তিনিই মাকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। মা'র এক কথা, আর সব যেমন তেমন, এই অসবর্ণ বিয়েতে কিছুতেই তিনি মত দিতে পারবেন না।

বড়দা বলেছিলেন, "আজকাল আর তাতে দোষ নেই, মা।

হামেশাই এমন হচ্ছে।"

"তাই বলে বামুনের মেয়ে? পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে না!"

"তোমার ছেলের বৌ যখন হবে, তখন তো অবশ্যই করবে।"

"তবে?"

"তুমি মা। তোমার আসন সব সময়ই অনেক উঁচুতে। তাই বামুনের মেয়ের প্রণাম কোনো অযোগ্য স্থানে যাবে না।"

মা তখনও মন প্রাণ দিয়ে কথাটা গ্রহণ করতে পারেন নি।

বড়দা এরপর খুব সহজভাবে সার কথাটি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন —"অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব ব্যাপারে অন্যের মতামতের অপেক্ষা কেউ বড় একটা রাখে না। তুমি মত দিয়ে দাও, মা। অন্ততঃ এই ভাবে তো সান্ত্বনা পাবে যে তোমার অমর্যাদা হয় নি।"

একটু থেমে আবার বলেছিলেন বড়দা, "সংসারে সবকিছুকে মানিয়ে নেয়াটা একটা বিরাট গুণ। এটার বড় অভাব আজকাল।"

বড়দার কোনো কথা বাবা যেমন কোনোদিন ফেলতে পারেন নি, মা'ও পারেন না। শেষ পর্যন্ত মা অনুমতি দিয়েছিলেন।

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই জয়ন্তী চ্যাটার্জি জয়ন্তী বোস হয়ে আমাদের সংসারে এলো। বড়দা তাঁর সাধ্য অনুযায়ী সেই অনুষ্ঠান ত্রুটিহীন করতে চেষ্টা করেছিলেন।

ভাবতে অবাক লাগে, অমিয় কুমার বোসের অবর্তমানে তাঁর বংশধরদের সংসারে এরই মধ্যে কত অনিয়মের স্রোত বয়ে চলেছে।

* * * *

প্রথম প্রথম মেজদা জয়ন্তীবৌদিকে নিয়ে বেড়াতে

বেরোনোর আগে মা আর বড়দার কাছে অনুমতি চেয়ে নিতেন। তা না হলে একটু অশোভন লাগে, হয়তো তারই জন্যে। অনুমতি যে নেয়া দরকার, এটা যে না বোঝেন তা নয়, তবুও একসময়ে রীতিটা একটু শিথিল হয়ে এলো।

ছুটি-ছাঁটায় জয়ন্তীবৌদিকে মোটরবাইকের পেছনে বসিয়ে বেরিয়ে যান। কোলকাতায় সিনেমা-থিয়েটার অথবা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে রাত্রি সাড়ে দশটা এগারোটায় ফিরে আসেন। আর এদিকে বড়দা তাদের না আসা পর্যন্ত ব্যালকনিতে বসে থাকেন। রাস্তায় মোটর-বাইকের শব্দ শুনলে নিজের ঘরে চলে যান।

একদিন মা মেজদাকে অনুযোগ দিয়েছিলেন—"এতো রাত্রিতে বাড়ি ফিরিস, অরুণকে তো জানিস, তোরা না ফেরা পর্যন্ত ও ঘরে যায় না। একটু সকাল সকাল ফিরলেই তো পারিস।"

"আমি নাবালক নই মা, যে আমার জন্যে দুশ্চিন্তায় রাত জেগে বসে থাকতে হবে। এভাবে বসে থাকাটা বড়দার একটা অভ্যেসে এসে দাঁড়িয়েছে। এটা এক ধরণের মানসিক অসুখ। আমি যেদিন কোথাও না বেরোই সেদিনও দেখবে তাই করছেন।"

অমার্জিতভাবে কথাগুলো বলেছিলেন মেজদা।

সামান্য ব্যাপার নিয়ে এতোগুলো কথা শুনতে হবে, মা তা ভাবতে পারেন নি। খানিকটা ভেজা গলায় বলেছিলেন, "রাগ করিস না বরুণ, ওর অক্ষমতাটাকেই আজকাল তুই খুব বড় করে দেখছিস।"

"আমিও আজকাল লক্ষ্য করছি মা, আমার কোনো কথাই

তোমরা এখন আর সহজভাবে নিতে পারো না।"

"তোর সঙ্গে তো তাহলে অনেক তর্ক করতে হয়। থাক্, তা আমি চাই না। তুই তোর ইচ্ছেমতোই কাজ করিস।"

বড়দা নীচ থেকে দোতলায় উঠে আসছিলেন। সিঁড়ির মুখেই মা'র সঙ্গে কথা হচ্ছিল মেজদার।

বড়দা জিজ্ঞেস করেছিলেন,—"কী হয়েছে? দু'জনের মুখই একটু ভার ভার মনে হয়?"

"রাত্রি করে মেজোবৌমাকে নিয়ে বাড়ি ফেরে তাই বলছিলাম।"

মা মুখে কৃত্রিম হাসি টানতে চেষ্টা করেছিলেন।

"ঠিকই তো। একটু সকাল করে ফিরলেই তো পারিস। রিষড়ে কোতরং-এর কাছে পথঘাট খুব সুবিধের নয়, প্রায়ই ছিনতাই হয়। তুই একা হলে কোনো ভাবনা ছিল না।"

জয়ন্তী বৌদি সেখান দিয়েই যাচ্ছিল।

"এতো অবাধ্য হচ্ছো কেন—কি গো?"

বড়দা হেসে বলেছিলেন।

এ-রকম খণ্ড খণ্ড কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ সংসারের একটা চিত্র দেখতে পেয়েছিলাম। কষ্ট হয় বড়দা আর বৌদির কথা ভেবে। সব দেখেও আমার বলবার কিছু এক্তিয়ার নেই। যে মানুষ সংসারে একটি পয়সাও ঠেকাতে পারে না, উপরন্তু পদে পদে যে বুঝতে পারে অন্যের রোজগারে তার ভরণ-পোষণ চলে—তার পক্ষে কোনো কথাই বলা সাজে না।

মা'ও বুঝতে পেরেছিলেন, সংসারে ভাঙন দেখা দিতে আর বেশী দেরি নেই। তাই একদিন বড়দাকে বলেছিলেন, "কোথায় আমার সবচেয়ে বড় কাঁটা বিঁধে আছে জানিস, অরুণ?"

বড়দা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মা'র মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

"সবকিছু ভুলে গিয়ে দিনের পর দিন বরুণ সংসার থেকে কেমন সরে যাচ্ছে লক্ষ্য করেছিস ?"

"আমাকে দেখে তোমার কী মনে হয়, মা ?"

বড়দা ম্লান হেসেছিলেন।

"সংসারটাকে বেঁধে রাখতে তোর চেষ্টার যে অন্ত নেই তা আমি বুঝি, অরুণ !"

"সে-দিক দিয়ে আমাকে স্বার্থপরই বলতে পারো, মা।"

"তোর মতো স্বার্থপর সংসারে ক'জন হতে পারে, বাবা ?"

বসু বাড়ির দোতলা কুঠিতে একতলায় বরাদ্দ একফালি ঘরে আজকাল আমার আস্তানা। পাশের ঘরটা এর চেয়ে অনেক বড়। ওটাই আগে ব্যবহার করতাম। সম্প্রতি তা ছাড়তে হয়েছে মেজদার আলাদা একটা বৈঠকখানার তাগিদে। নতুন ঝক্‌ঝকে সোফা-সেট, বউবাজারের অতি-পালিশ-করা শৌখিন বইয়ের আলমারি ঘরটার চেহারাই পাল্টে দিয়েছে। বাইরের লোককে বসাবার মতো বাবা যে ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছেন, তা নাকি মেজদার ঠিক পছন্দ নয়। বহু পুরানো বেতে বোনা চেয়ার, পুটিং খসে-পড়া ফাঁকে ফাঁকে আরশোলার ঘাঁটি! ওসব শূয়োরের গোয়ালের মতো জায়গায় কি বাইরের কোনো ভদ্রলোককে বসানো যায়?

দু'একটা পার্টিও আসে মাঝে মাঝে। মেজদা খোশামোদ করবার জন্যে নিয়ে আসেন। তাদের খুশী করতে মেজদার চেষ্টার

অন্ত নেই। কয়েকদিন আগে আড়াইশো টাকা দিয়ে একটা শাড়ী কাপড় এনেছিলেন। প্যাকেটের উপর কোলকাতার একটা নামী দোকানের ছাপ। জয়ন্তী বৌদি তো খুব খুশী। মেজদার হাত থেকে প্যাকেটটা ছিনিয়ে নিয়ে কাপড়ের ভাঁজটা প্রায় খুলে ফেলেছিল আর কি!

"করছো কী, করছো কী! লাট হয়ে যাবে।"

জয়ন্তী বৌদি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে যায়। পায়ে পায়ে দু'জনেই নিজেদের ঘরের ভেতর চলে গেলেন। মেজদা আরো কিছুক্ষণ ঘাঁটিয়ে নিয়ে আসল কথাটা বললেন, "এটা তোমার জন্যে নয়, জয়ন্তী।"

"তাহলে?"

"নমস্কারী বোঝ? ওটা তাই। শালাদের খুশী রাখতে হয় মাঝে মাঝে।"

"তাই বলে অতো দামের একটা শাড়ী?"

"তুমি ভেবেছো ঐ শাড়ী নিয়েই খালাস? এর সঙ্গে বিল থেকে ফাইভ পারসেণ্ট অলিখিত কমিশন।"

"শাড়ীটা ওরা হাত পেতে নেবে?"

"নেবে না মানে? অবশ্য হাত পাত্তে পাত্তে বলবে—আবার এটা কেন? আমরাও বিনয়ে গদ্ গদ্ হয়ে বলি— এটা তো আপনার প্রাপ্য স্যার, যেন ওর বাপ জমা রেখে গিয়েছিল। শুধু কি তাই? আরো সব কথা শুনলে তুমি বলবে—থাক্, বিজনেস করে কাজ নেই, চাকরি দেখে নাও। গাল-পোড়া মুখার্জিকে দেখেছো তো, আমাদের বাড়িতে একবার এসেছিল? নাম্বার ওয়ান ঘুঘু লোক, মেড়োর বাচ্চাদেরও ঘোল খাওয়ায়। এক বছরের একটা জেন্যুইন অর্ডার পাবার জন্যে কী করেছিল জানো?

ফ্রী-স্কুল স্ট্রীট থেকে একটা মাগী ধরে নিয়ে ভেট দিয়েছিল। হুঁ হুঁ, যেমন তেমন হলে শালাদের মন ওঠে না, একেবারে ডাঁশা ডাঁশা''—

''থামো তো তুমি! যতসব আজ্ঞে-বাজ্ঞে কথা!''

জয়ন্তী বৌদির ধমক খেয়ে মেজদা সেখানেই থেমে গিয়েছিলেন।

ব্যালকনিতে বসে একটা 'দেশ' পত্রিকা ঘাঁটতে ঘাঁটতে কথাগুলো শুনেছিলাম। ধরে রাখতে পারলে ব্যবসার জগতে অনেক উপরে উঠতে পারবেন মেজদা। অনেক অলি-গলির ঠিকানাই তো পেয়ে গেছেন এরই মধ্যে! লক্ষ্য করেছি, আজকাল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে অসংলগ্ন পদক্ষেপও পড়ে যায় মাঝে মাঝে। কিছু পয়সা হলে অনেক সময় অনেকে যে-সমস্ত গুণগুলোকে এড়াতে চাইলেও ঠিক এড়াতে পারে না—তাই যখন কিছু কিছু রপ্ত হয়ে গেছে, তখন মেজদাকে আর পায় কে! এখন দাতা আর গ্রহীতা যদি একাসনে বসে ছিপি খোলার ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করে ফেলতে পারেন তাহলে মেজদা চড় চড় করে উপরে উঠে যাবেন। উপর থেকে আরও উপরে। বড়দা শুধু ক্রাচে ভর দিয়ে অসহায় চোখে দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন—তাঁর মেজোভাই ব্যবসার জগতে কত বড় হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন! দেখতে দেখতে হয়তো বার বার দীর্ঘশ্বাস পড়বে এই ভেবে—অমিয় কুমার বোসের পাতা সংসারটা কত দ্রুত তালে অতি-আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সেখানে বসে থাকতে আর ইচ্ছে হচ্ছিল না। নেমে এলাম নিজের ঘরে। সন্ধ্যা হতে বড় একটা দেরি নেই। হীরুর মা চা দিয়ে গেছে। বড়দার ক্রাচের খট্ খট্ শব্দ শোনা যাচ্ছে বারান্দার

সিঁড়িতে। স্কুল থেকে ফিরেছেন। বারান্দা দিয়ে শব্দটা আসতে আসতে আমার ঘরের সামনে একটু থেমে আবার দোতলার সিঁড়িতে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। শব্দটা যেন হৃদপিণ্ডে ঘা দিতে থাকে অনেকক্ষণ ধরে।

বৌদি অফিস থেকে ফিরে আসতে সন্ধ্যা সাতটা বেজে যায়। হাওড়া ব্রীজ জ্যাম থাকলে আরও দেরি হয়। কোনোরকমে টের পেলে রাজা সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে গিয়ে জড়িয়ে ধরে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই ছেলেকে আদর সোহাগ করেন। খুব বেশীক্ষণ পারেন না, মাথার উপরে কাজের বোঝা। তাড়া-তাড়ি করে কাপড়-চোপড় পাল্টে বাথরুমে ঢুকে গায়ে দু'এক বালতি জল ঢেলে নেন। ট্রেন-বাসের ভিড় ঠেলে এসে গায়ে জল না দিয়ে থাকতে পারা যায় না। সময় না থাকলে কোনো কোনো দিন হাত মুখ ধুয়েই বেরিয়ে আসেন। তারপর রান্নাঘর। হীরুর মা বৌদি না আসা পর্যন্ত বসে থাকে। এলে উনুনে আঁচ দিয়ে বাড়ি যায়। বিকেলের জলখাবার স্টোভে সারা হয়। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতে রাত্রি সাড়ে দশটা-এগারোটা বাজে। প্রথম প্রথম জয়শ্রী বৌদি কিছুটা কাজ এগিয়ে রাখতো। এখন খুব একটা আসতে চায় না। অথচ সংসারটা সবারই। সবারই সমান দায়িত্ব থাকা উচিত। একই ঘরের বৌ দু'জন। তবে এই অনিয়মটা কেন? একজন সারাদিন অফিস-কাছারিতে খেটে গাড়ি-ঘোড়ার ধকল সয়ে বাড়িতে এসে আবার রান্নাঘরে ঢুকবেন, আর অপরজন সব দেখেও নির্বিকার ভাবে নিজের ঘরে শুয়ে-বসে সময় কাটাবে—সংসারে মনুষ্যত্বের এতোটা অভাব হয়ে গেছে! কিছুদিন আগেও মা বলে বলে পাঠিয়েছেন। কিন্তু যে মানুষ সব দেখেও দেখে না, বুঝেও বুঝে না, তাকে আর কত বলা যায়? মা

নিজেই বৌদিকে সাহায্য করতে আসেন।

মাঝখানে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম। ভোর সাড়ে-চারটের আবার উঠতে হয়। চোখ কচ্ কচ্ করে। আটটার ভেতর রান্না সারতে না পারলে সবকিছুই এলোমেলো হয়ে যায়। রান্না ছাড়াও তো ঘর-সংসারের অনেক কাজ থাকে।

আমার একটা চাকরি না হলে আর কিছুতেই চলছে না। বৌদির এই পরিশ্রম একটা জোয়ান ছেলে হয়ে বসে বসে দেখা সম্ভব নয়। তাঁর সামনে গিয়ে ঠিক সহজ হয়ে অনেক চেষ্টা করেও দাঁড়াতে পারা যায় না। দশটা-পাঁচটা খেটে রক্ত-জল-করে তিনি ঘরে পয়সা তুলছেন, আর আমার মতো ছেলে বসে বসে সেগুলো ধ্বংস করছি—এসব কথা ভাবলে নিজেকে খুব অপরাধী বলে মনে হয়।

বৌদি মনের কথা বুঝতে পারেন। সান্ত্বনা দেন—"পুরুষ মানুষ চিরদিন বসে থাকে না। একদিন দেখবে কোথা দিয়ে কী হয়ে গেছে।"

"বসে থাকতে আর একেবারে ভালো লাগছে না, বৌদি। জীবনটা হয়তো এভাবেই নষ্ট হয়ে যাবে।"

"যার শুরুই এখন পর্যন্ত হলো না তার আবার নষ্ট কী ?"

এমন সান্ত্বনা আর ক'জন দিতে পারে! চোখের জল চাপতে পারা যায় না।

"তুমি সবকিছুই হাল্কা করে দাও, বৌদি।"

বৌদি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন।

"জীবনটা যার অনেকখানি ভারি হয়ে গেছে, তোমরা যদি তাকে খানিকটা হাল্কা রাখতে সাহায্য না করো তাহলে সে বাঁচবে কেমন করে, ছোট ঠাকুরপো!"

গলাটা ভারি হয়ে আসে বৌদির।

*   *   *

সেদিন দিল্লীরোডের কারখানার গেট থেকে ফিরে অনেকক্ষণ নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসেছিলাম।

বৌদি অফিস থেকে ফিরে রান্নাঘরে ঢুকেছেন। আস্তে আস্তে ঘরের দরজাটা খুলে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। বৌদি উনুনে তরকারী চাপিয়ে দিয়ে একটা রেকাবিতে আটা মাখছেন।

"হলো কিছু?"

আটা মাখতে মাখতে জিজ্ঞেস করেছিলেন বৌদি।

"ওখানে আমার চাকরি হবে না।"

কথাটার মধ্যে হয়তো কিছুটা বিরক্তিই প্রকাশ পেয়েছিল।

"হবে না কেন?"

"সে অনেক ব্যাপার। থাক্ ওসব কথা।"

"শুনতে পারি না?"

"শুনে আর কী করবে? সেই পুরানো কাসুন্দি। ভালো লাগে না।"

"আমি তো প্রথমেই নিষেধ করেছিলাম।"

"নিষেধ তো করেছিলে ভয়ে। দিল্লীরোডে একা পেয়ে কেউ-না ছুরি চালিয়ে দেয়।"

"তা চাকরি হবে না কেন?"

"বললাম তো—শুনে কী করবে? সেই ছুরি-পিস্তলেরই ব্যাপার।"

এবার বৌদি অনেকটা অনুমান করে নিয়েছিলেন বোধহয়।

"তাহলে আমি যে-ভয় করেছিলাম তা ঠিকই বলো ?"

"তোমার ভয় ছিল পথে।"

"ওই একই কথা হলো। থাক্ বাপু আর কিছু শুনতে চাই না। ও-মুখো আর হতেও হবে না।"

সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম হয় নি।

চাঁদু!

ক'টা মানুষ তুমি খুন করেছো জানি না। কিন্তু আমার সেই সকালটাকে তুমি নৃশংসভাবে খুন করেছো—যে সকালে ঘাসের আগায় মাকড়সার জালের মতো শিশির ঝরে পড়েছিল।

বড়দা মাঝে মাঝে মেজদার সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন। মেজদা নিজের মতামত বড় একটা প্রকাশ করেন না। শুনতে শুনতে কখনও কখনও রাগ করে এমন দু'চারটে কথা বলে ফেলেন যার পর আর কোনো কথাই চলে না। ইচ্ছে করলে অবশ্য পাল্টা কথা কিছু বলা যায়। কিন্তু বড়দা অধিকাংশ সময় চুপ করেই থাকেন। বড়দা যেন কেমন নির্জীব হয়ে যাচ্ছেন দিন দিন। আগের সেই দীপ্ত ভাব আর নেই। দেখলে মনে হবে, যেন অবহেলিত হয়ে এ-বাড়িতে দিন কাটাচ্ছেন।

মেজদাকে লক্ষ্য করছি, আজকাল প্রায়ই খুব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে, কখনও-বা অকারণে বাড়িতে একটা অশান্তি বাধাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের কাছ থেকে এ-ব্যাপারে কোনোরকম সাড়া পাওয়া যায় না বলে খুব সুবিধা করতে পারেন না।

রবিবার খাবার টেবিলে আমার কথা উঠলো।

মেজদা আস্তাভাবে বললেন, "দেখো কাউকে ধরে কোনো কিছুতে লাগিয়ে দিতে পার কিনা।"

"কাকে আর ধরবো বল?" দায়িত্বটা যেন মেজদাই নেন, বড়দার কথায় এমন একটা সুর প্রকাশ পেলো। "আমার নিজেরই চলাফেরা করতে কিছুটা অসুবিধে হয়, যেন অল্পতে হাঁফিয়ে পড়ি। তাই কাজের সময় ছাড়া কোথাও আর বেরোতে ইচ্ছে হয় না।"

"এটাকে অকাজ মনে করছো কেন?"

কথাটা বলতে এতোটুকু বাধলো না মেজদার। লক্ষ্য করেছি, অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভাতের থালা থেকে মুখ তুলতে পারেন নি বড়দা। কিছুক্ষণ পরে এই অপ্রস্তুত ভাবটা সহজ করবার জন্যে নিজেই একটু হাসলেন। লজ্জা মেশানো ম্লান হাসি। বললেন, "থাক্ ওসব কথা। তোর বিজনেস কেমন চলছে বল নতুন যে বড় অর্ডারটার কথা শুনছিলাম তার কী হলো?"

"এখনো পাকাপাকি কিছুই হয় নি। ঝুলে আছে। এক-দিকে আমি আরেকদিকে ভালোটিয়া। দেখি কা'র হয়।"

"তুই এক কাজ কর না বরুণ, তরুণটাকে না হয় তোর ব্যবসায়েই ঢুকিয়ে নে। একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিবি। তুই বাইরে বাইরে থাকিস, অফিসটা তো দেখে শুনে রাখতে পারবে। তারপর নিজের উৎসাহ থাকলে সবই করা যায়।"

বড়দার মুখের ভাবটা দেখে মনে হলো, এই কথাগুলো বলে মুহূর্তের মধ্যে তিনি যেন একটা বিরাট সমস্যার সমাধান করে ফেললেন।

এই পরিস্থিতিতে এমন অভিভাবকসুলভ কথা আর কোনো মানুষ বলতে পারে কিনা আমার জানা নেই। জটিলবৈষয়িক নিয়ম-কানুনগুলো গভীরভাবে চিন্তা করলে বড়দা হয়তো কিছুতেই

কথাগুলো বলতে পারতেন না।

মুখের উপরে 'না' করতে পারেন নি মেজদা।

"সে দেখা যাবে।"

নিজের ভাইকে ব্যবসায় নামিয়ে নেবেন—এ যেন এক বিরাট ভাবনার বিষয়। অনেক ইন্‌ভেষ্টিগেশনের ব্যাপার!

বড়দাকে এরপর আর বেশী কথা বলবার সুযোগ দিলেন না মেজদা। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে চলে গেলেন।

বড়দা আর বৌদি না থাকলে আমার কী দশা হতো অনুমান করতে পারি। বড়দার জন্যে মনটা বড় আকুলভাবে কাঁদে। কী এক কর্মবান পুরুষ আজ ক্ষমতা হারিয়ে দেয়ালে ক্রাচ দু'টি ঠেকিয়ে ব্যালকনিতে বসে বসে বাইরের কর্মক্লান্ত সংসারকে দেখেন! অদৃষ্টের কী নিদারুণ পরিহাস! যে মেজদাকে নিজের সর্বস্ব দিয়ে ব্যবসায় নামিয়েছিলেন, সেই মেজদা আজ পরোক্ষভাবে তাঁকে অস্বীকার করে যান। বুঝিয়ে দিতে চান তিনি এখন স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

বাবার বাল্যবন্ধু দীনেশকাকা মাঝে মাঝে এসে বড়দাকে সঙ্গদান করে যান। দীনেশকাকা আর বাবা একসঙ্গেই যুক্তি করে এই বাহির শ্রীরামপুর রোডে পাশাপাশি জায়গা কিনে বাড়ি করেছেন। সে-সমস্ত পুরানো দিনের কথাও হয়। ডোবা আর জঙ্গলে ভরা ছিল জায়গাগুলো। দু'চারটে বাড়ি সবে হয়েছে। রাত্রিতে ভয়ে ভয়ে থাকতে হতো। সে-সব কথা যেন কিছুতেই পুরানো হতে চায় না। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, আজকালকার ছেলেদের মধ্যে তার প্রভাব, বেকার-সমস্যা, একটা অবক্ষয় যে গোটা সমাজকে অপমৃত্যুর দিকে নিয়ে চলেছে—কিছুই বাদ যায় না।

বাবা বেঁচে থাকতে দীনেশকাকা রোজই একবার করে

আসতেন। বাবাও যেতেন। না গেলে বলতেন, "তার মানে কি জানো, অমিয়? তুমি আমাকে ইনডাইরেক্টলী বোঝাতে চাও যে তোমার চা-বিস্কুট এভাবে ধ্বংস করা চলবে না।"

দু'জনেই হো হো করে হেসে উঠতেন। উচ্ছ্বসিত হাসি। বড়দার আকস্মিক দুর্ঘটনার পর বাবার মুখে কোনোদিন কেউ আর হাসি দেখতে পায় নি। দীনেশকাকা এসে গল্প করতেন, কিন্তু সেই আমেজ যেন ফিরে আসতো না।

বাবাকে মাঝে মাঝে বলতে শোনা গেছে—"মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না, দীনেশ। জীবনটা একরকম ভালোই কাটিয়ে এসেছি। অভাব অনটনে অবশ্য কষ্ট করতে হয়েছে কিছুদিন, তাহলেও সে-সবের কথা আর যেন মনে ছিল না। এই শেষ বয়সে যে দাগা পেলাম, তা হয়তো জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভুলতে পারবো না।"

দীনেশকাকা সান্ত্বনা দিতেন—"দুঃখ করে আর কী করবে, অমিয়? নিয়তির উপর কারো হাত নেই। ওটাকে মেনে নিতেই হয়।"

বাবা কোনোদিনই মেনে নিতে পারেন নি। নিয়তি আছে, অলক্ষ্যে থেকে সে বিধান দেয় কিন্তু সংসারে ক'জনে মেনে নিতে পারে তার অনুশাসন?

বাবার মজবুত আসন টলে গিয়েছিল।

মারা যাবার কয়েকদিন আগে বড়দাকে ডেকে বলেছিলেন,—"ঝড়-তুফান কেবলমাত্র মহীরুহের উপর দিয়েই যায়, অরুণ। সে-আর তোমাকে কী বলবো আমি! তুমি আমার বড় ছেলে, তোমার উপরে আমার অনেক আশা ছিল। এখনও কিন্তু তা আমি হারাই নি। আমার কথায় দুঃখ পেও না, তোমার চেয়ে

আমিও কম দুঃখী নই। যে-কথা বলছিলাম—আমার অবত মানে তোমার উপরই এসে এ-বাড়ির সব দায়-দায়িত্ব পড়বে। আমি বুঝি, বরুণ-তরুণ তোমার মতো মন পায় নি। হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান হয় না। সংসার সবে শুরু করেছো, যতই তার ভেতরে যাবে, দেখবে অনেক সমস্যা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে চেয়ে মহৎ কর্তব্য থেকে কোনোদিন বিচ্যুত হয়ো না। আমি জানি, তোমাকে এ-সব কথা বলবার কোনোই প্রয়োজন পড়ে না।"

হয়তো সেই চেষ্টাই করছেন বড়দা। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা ভুলে। অবহেলিত হয়েও পিতৃসত্য পালনের ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন দিনের পর দিন। হয়তো বৌদিও স্বামীর পদাঙ্কই অনুসরণ করে চলেছেন।

কয়েকদিন পরে চাঁদুর সঙ্গে দেখা হলো স্টেশনের ধারে সিনেমা হলটার সামনে। এদিকটায় চাঁদুকে বড় একটা দেখা যায় না। হয়তো কোনো ধান্দায় এসেছিল। সঙ্গে ছিল কানা বলাই।

আমাকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এলো চাঁদু। গোঁফে পাক দিতে দিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

"কানার মুখে শোনলাম, ওখানে নাকি গিয়েছিলি ?"

খুব কায়দা করে কথাটা জিজ্ঞেস করলো চাঁদু।

"কোথায় ?"

"তাহলে আমি কি বুঝবো তুই আমার কথাটা বুঝতে পারলি না ?"

"তোমার যা ইচ্ছে বুঝতে পারো।"

বলে বাড়ি চলে আসবার জন্যে পা বাড়ালাম।

চাঁদু পেছন থেকে ডাকলো, "দাঁড়া বে! রোয়াব দেখাচ্ছিস কেন? কেউ কি তোর রোয়াবের ধার ধারে?"

"আমার সময় নেই।"

শুনে হো হো করে হেসে উঠলো চাঁদু।

"শুনলি কানা, শালার নাকি সময় নেই। ঘোড়ার ঘাস-টাস কাটে বোধ হয় আজকাল।"

কানা বলাই মুচকি হাসলো।

"আরো কিছু বলতে চাও?"

চোয়াল দু'টি আমার শক্ত হয়ে আসছিল।

"তুই কি মনে করেছিস বাড়ির কাছে বলে তোকে ভয় পেয়ে কথা বলছি? এখান থেকে তুলে নিয়ে যেতে পারি জানিস?" চাঁদু কান খোঁচাতে খোঁচাতে বললো। "সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করিস নি কেন?"

"ইচ্ছে হয় নি, তাই।"

"ইচ্ছে হয় নি? তোর কাজের দরকার নেই?"

"আছে।"

"তবে?"

"আমার জন্যে তো অনেক করেছো, তাই আর বিরক্ত করতে চাই নি।"

"শালা কেমন চিকনাই চিকনাই কথা বলছে দেখছিস কানা? তোরা শালা মরে গেলেও এমন পারবি না।"

কানা বলাই গদ্ গদ্ হয়ে বললো, "কী বলছো গুরু, তোমার মুখের উপর এমন কথা বলবো! বললে ধর্মে সইবে? হাজার হলেও"—

"চুপ কর বে!"

ধমক খেয়ে কানা বলাই আধা পথেই চুপ করে গেল।

চাঁদু পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে সামনে ধরলো, "বিড়ি খা।"

"কেন আমাকে বিরক্ত করছো!" কিছুটা ধমকের সুরে কথাটা বেরিয়ে এলো।

"এদিকে একটা ছাড়ো গুরু।"

কানা বলাইয়ের কথায় কান না দিয়ে চাঁদু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার সেই চাহনির মধ্যে রাগ ছাড়া আরও একটি অভিব্যক্তি ছিল, যার জন্যে মনে হয়েছিল—তুলে নিই একটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলাম না।

এভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গোটা প্যাকেটটা ছুঁড়ে নর্দ্দমায় ফেলে দিয়ে চলে গেল চাঁদু।

যতক্ষণ দেখা যায়, চেয়েছিলাম তার দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল—দিল্লীরোডের কারখানায় চাকরিটা আমি ইচ্ছে করেই হারিয়েছি।

সন্ধ্যার একটু আগে বাড়ি ফিরে কলতলায় হাত-মুখে জল দিচ্ছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, আজ আর উপরে যাব না। মেজদা আজ অফিসে যান নি। মেজদার নজর এড়ানোর জন্যেই উপরে না-যাওয়ার কথা ভাবছিলাম।

হীরুর মা একটু আগে বড়দাকে চা দিতে গেছে। কিন্তু আমি কলতলায় থাকতে থাকতেই ভরা কাপ নিয়ে ফিরে এলো।

জিজ্ঞেস করলাম, "নিয়ে এলে যে? বড়দা চা খান নি?"

"খেলেন না তো!"

"কেন? কী বললেন?"

"কিছু বলেন নি। হাত দিয়ে শুধু বারণ করলেন। মুখটা

ভার ভার দেখলাম।"

হয়তো মেজদার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে। মেজদা তো আছেনই কেবল ঐ তালে। কোথাও একটু-আধটু সুযোগ পেলে আর রক্ষে নেই। কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে তারপর নিজের ঘর নেন।

বৌদি অফিস থেকে না আসা পর্যন্ত কিছু জানা যাবে না। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা যে আমাকে নিয়েই এ-কথা তখন জানতে পারি নি।

বৌদি অফিস থেকে ফিরলে বড়দা আমাকে ডাকিয়ে উপরে নিয়ে গেলেন। ভয়ে ভয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ালাম।

"তুই কি আমাকে পাগল করে ছাড়বি!"

তখনও ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারি নি। কাজেই আমার বলবার মতো কিছুই ছিল না।

"আবার নাকি তুই চাঁদুর সঙ্গে মেলামেশা করছিস?"

"তোমাকে এ কথা কে বলেছে?"

মেজদা তাঁর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। শেষে দু'পা এগিয়ে এসে বললেন, "বাইরের কেউ এসে বলে যায় নি। আমি নিজে দেখেছি। চাঁদুর সঙ্গে সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলিস নি? অস্বীকার করতে পারবি?"

"অস্বীকার তো আমি করছি না।"

"অস্বীকার করছো না ভালো, কিন্তু বাহাদুরী করে সেকথা বলতে লজ্জা করছে না?"

"তোমরা কেউ আসল ব্যাপারটা জানতে চেয়েছো?"

"আমি কিছু জানতে চাই না। শুধু জেনে রাখো, এ-বাড়িতে যেন আর পুলিশের হামলা না হয়। বড়দাকেও এ কথা বলে

দিয়েছি।''

বৌদি বললেন, "কী হয়েছে, ব্যাপারটা ভালো করে শুনেই নাও না, বড় ঠাকুরপো।"

''আমার দরকার নেই। তোমাদের ইচ্ছে হয় সারারাত ধরে শোন।'' দাপট দেখিয়ে নিজের ঘরের সামনে চলে গেলেন মেজদা। ''কোথায় কোন্ অপকর্ম করে আসবে, শেষকালে বাড়ি শুদ্ধ সবার হাতে যখন হাতকড়া পড়বে তখন তোমাদের চৈতন্য হবে।''

"তা আমি কী করবো বল্!"

বড়দা যেন অসহিষ্ণু হয়ে মেজদার দিকে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন।

''কী করবে না করবে আমি কী বলবো?"

''এতোটা যখন চিন্তা করতে পারলি তখন তার ভালোটা কী করে হয় তা বলতে পারবি না?"

''আমি লক্ষ্য করছি বড়দা, তোমরা সব সময়ই আমাকে আজকাল ছুতো-নাতায় কোনো না কোনোভাবে অপদস্থ করতে চেষ্টা করো। তোমাদের মনে কী আছে তা তোমরাই জানো।"

"তুই মিছামিছি রেগে যাচ্ছিস, বরুণ। আমাকে ভুল বুঝে রাগ করছিস। একটু ঠাণ্ডা মাথায় সব চিন্তা করে দেখ। তুই তো এতোসব বলে যাচ্ছিস, কিন্তু বলতো, ঐ হতভাগাটা কবে খুব বড় রকমের অপরাধ করেছে? করেছে কোনোদিন? খুন? ছিনতাই? কাউকে কোনো আজে-বাজে কথা? তবে অপরাধটা তার খুব ভারি কোথায় দেখলি? এমন দলে পড়ে সারাজীবনের মতো কতো ছেলে নষ্ট হয়ে যায়!"

''ও যে যাবে না তা তুমি কী করে বুঝলে?"

বড়দা প্রশান্তভাবে বললেন, ''যাবে না. আমি বুঝি। নষ্ট

হয়ে যাবার ছেলে সে নয়।”

মেজদা আর বিশেষ কিছুই বলেন নি। নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন।

সময় বুঝে রান্নাঘরে বৌদির সামনে গিয়ে বসলাম। অনেক কথা বলবার ছিল বৌদিকে। মনের গভীরে যে-কথা মোচড় দিয়ে যায় বার বার সে-কথাও। কিন্তু কিছুই গুছিয়ে বলতে পারলাম না। বলতে গিয়ে সব এলোমেলো হয়ে গেল।

বৌদি জিজ্ঞেস করলেন, “চা খাবে?”

“দাও।”

বৌদিও একটু খেলেন। খেতে খেতে বললেন, “শুধু তোমার জন্যে নয়, ছোট ঠাকুরপো, সংসারের আরও দু'একজন মানুষের জন্যে বলছি।”

বৌদিকে বাধা দিয়ে বললাম, “তুমি কী বলবে আমি জানি। কিন্তু চাঁদু যদি নিজে এসে আমার সঙ্গে কথা বলে আমি কী করতে পারি বলো?” বলে একটু চিন্তা করে আবার বললাম, “তবে একটা জিনিস আজ আমি বুঝতে পেরেছি, বৌদি। মানুষ শত খারাপ হয়ে গেলেও হয়তো সবটাই খারাপ হয়ে যায় না। চাঁদুকে দেখে কেন যেন আমার তাই মনে হলো।”

বৌদি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন।
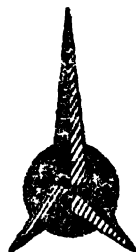
সংসারের অন্তঃস্থল দিয়ে যেন একটা বিরাট ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। জানি এ রোধ করবার নয়। বড়দা, মা কারোরই সাধ্য নেই।

নিজের চিন্তা তো আছেই। বড়দার জন্মে বড় কষ্ট হয়। সাফল্যের দোর-গোড়ায় গিয়েও তিনি আর এগোতে পারলেন না। বৌদির গৃহ-জীবনের শান্তিও অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেল। বাবা যে কাজ পছন্দ করতেন না আজ তাতেই যেতে হলো বৌদিকে। বড়দার জীবনের ব্যর্থতার মধ্যে বৌদির একমাত্র সান্ত্বনা রাজা। তাকে যেমন ভাবেই হোক, মনের মতো করে মানুষ করতে হবে। রাজার মুখের দিকে চেয়ে তিনি তাঁর সমস্ত বেদনা ভুলে থাকতে চান।

খুব মিষ্টি গানের গলা ছিল বৌদির। এখন আর নেই। চর্চার অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। মনে আছে, অনেক রাত্রিতে মাঝে মাঝে খালি গলায়ও গান করতেন বৌদি—'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।'

বাবাও শুনতেন তন্ময় হয়ে। তিনি বলতেন, "সংগীত মানুষের মনকে পবিত্র করে, স্বর্গীয় সুধায় ভরিয়ে দেয়। অবশ্য সব সংগীতেরই সে-ক্ষমতা থাকে না।"

বড়দার দুর্ঘটনার পর থেকে বৌদিকে আর গান করতে শোনা যায় নি কোনোদিন। বাবা বুঝাতেন—"চর্চাটা ছেড়ো না বৌমা। জীবনে সুখ-দুঃখ পাশাপাশি চলে, সংগীতের মধ্য দিয়েই অনেক সময় জাগতিক সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে ওঠা যায়।"

অপরকে উপদেশ দিয়েও, বাবা কিন্তু নিজে কোনোকিছু দিয়েই জাগতিক সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি।

পরদিন সকালে খাবার টেবিলে চা খেতে বসে বড়দার মুখোমুখি হতে হলো। মেজদা এখনও আসেন নি। আজ রবিবার, তাড়া নেই বলেই হয়তো একটু দেরিতে আসবেন। মা এতক্ষণ ঠাকুর ঘরে ছিলেন। পুজো সেরে তিনি এসে টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, "আমি অনেক ভেবে দেখলাম অরুণ, ওকে এখানে রাখা ঠিক হবে না। কানপুরে শোভার ওখানে পাঠিয়ে দে। এখানে থাকলে ওরা ওকে মেরে ফেলবে।"

শোভা আমার দিদি। বড়দার ছোট।

বড়দা কিন্তু মা'র কথা মেনে নিতে পারলেন না। বললেন, "না মা, কোথাও পালিয়ে গিয়ে কাজ নেই। তাতে সমস্যার সমাধান হয় না। বরং আরো জটিল হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া এখন কানপুরে পাঠিয়ে দিলে যদি কোথাও থেকে দু'একটা ইণ্টারভ্যু

আসে তাহলে সেগুলো নষ্ট হবে।”

“কিন্তু ওদের তো কোনো বিশ্বাস নেই, অরুণ। যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।”

“ভয় পেও না মা, ওরা কিছুই করবে না।”

“তুমি সেই গ্যারান্টিও দিতে পার না।”

মেজদা কখন এসে দরজার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন টের পাই নি।

বড়দা কিছু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, “এতে গ্যারান্টির কী আছে। একজন একজনকে শুধু শুধু মারতে যাবে?”

“ওখানেই তোমার বোঝার ভুল”

বলে মেজদা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। “একজন একজনকে শুধু শুধু মারে না, এটা তুমি কেন, সবাই জানে।”

“তুই কি শুভার সেঙ্গুইন যে ওসব দলবাজীর মধ্যে এখনো সে আছে?”

“আমার চেয়ে তোমরাই তো বেশী জানো।”

“আমার উপর সে-বিশ্বাস যদি তোর থেকে থাকে তাহলে ওকে এখানেই থাকতে দে।”

“আমি দেয়া না দেয়ার কে! তোমরা ইচ্ছে হয় পাঠিয়ে দাও, ইচ্ছে হয় রাখো। তবে ওর ভালোর জন্যেই চেয়েছিলাম এখান থেকে আপাতত ও চলেই যাক।”

বলে মেজদা যেন তেতো মুখ করে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। দু'চুমুকে কাপটা শেষ করে আবার বললেন, “জানলে বড়দা, গোড়ায় যদি ওকে এত্তোটা প্রশ্রয় না দিতে তাহলে হয়তো ও মানুষ হতে পারতো।”

“বাড়িতে কি শুধু আমি একাই ছিলাম, তোরা ছিলি না? নিষেধ করতে পারিস নি?”

বড়দার গলা কিছুটা উত্তেজিত শোনালো।

"উত্তেজিত হয়ো না, বড়দা। আমাকে যদি সে-ক্ষমতা তোমরা দিতে তাহলে নিশ্চয়ই ও একটা অমানুষ হবার সুযোগ পেতো না।"

"তোর সে-ক্ষমতা নেই একথা তোকে কে বললে?"

"ও বলে দিতে হয় না, বড়দা, ওটা বোঝার জিনিস।"

"তুই কি এই সকালে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলি?"

বৌদি মেজদাকে বললেন, "তুমি কথা বলো না তো, বড় ঠাকুরপো। ওঁর যা ইচ্ছে তাই বলুন।"

মেজদা মৃদু হেসে বললেন, "ধীরে বৌদি ধীরে। ভুলে যেও না, কথা কেনা-বেচা করেই আমার দিন কাটে।"

যেন কিছুটা লজ্জা পেয়ে গেলেন বৌদি। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, "পদে পদে একটা মানুষ তোমাদের কাছে যেখানে শুধু দোষই করে যাচ্ছেন সেখানে আমার আর কী বলবার আছে বলতে পারো, বড় ঠাকুরপো?"

বলে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন বৌদি।

মেজদা যেন এই মুহূর্তে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। শেষে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে কতকগুলো অবান্তর কথা বললেন, "আমি সব বুঝে নিয়েছি: আমাকে আর কিছু বোঝাতে হবে না। মা পর্যন্ত আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলেন না। জয়ন্তী এ-বাড়ির বৌ, মা ওকে কী চোখে দেখেন তা আমি বুঝি না বলতে চাও?"

মা-ও দীপ্তস্বরে বললেন, "সুমিত্তাও এ-বাড়ির বৌ, বরুণ। তুই তো অনেক কিছুই বুঝিস, তবে কতগুলো সহজ জিনিস বুঝে যদি বিচার করতিস তাহলে হয়তো একথা বলতে পারতিস না। এগুলোও কাউকে বলে দিতে হয় না, বুঝে নিতে হয়।"

"কী বলতে চাও, মা ?"

"সংসারটাকে সব অবস্থায়ই নিজের বলে ভাবতে হয়, বরুণ। চোখ মেলে কোনোদিন তাকিয়ে দেখেছিস সুমিতার দিকে? সারাদিন অফিস করে বাড়িতে ফিরে একটু বিশ্রাম পর্যন্ত না নিয়ে হেঁশেল থেকে শুরু করে সংসারের খুঁটিনাটি সব কাজ ওকে একাই সামলাতে হয়, এর মধ্যে জয়ন্তীর কোনো দায়িত্ব নেই? সব দায় কি ঠেকেছে বড় বৌয়ের? তার স্বামী অচল বলে? এ-সমস্ত কথা বলি বলেই আমি তোদের কাছে ভালো নই। তোর বৌকে দেখতে পারি না। তুই কোনোদিন বিচার করে দেখেছিস, তোর বৌ খারাপ করছে না ভালো করছে? ভেবেছিস কিছু টাকা ঠেকিয়ে দিলেই সংসারের সব দায়িত্ব ফুরিয়ে গেল?"

পরিস্থিতিটা আরও ঘোরালো হয়ে পড়েছে বলে বড়দা মাকে বাধা দিয়ে বললেন, "তুমি আবার এর মধ্যে কেন এলে, মা?"

"ভালোই হয়েছে। যা হবার একটা কিছু হয়ে যাক। তোমাদেরও কোনো দায় থাকবে না, আমিও নিশ্চিন্ত হই।"

মুখ নীচু করে মেজদা কথাগুলো বলে গেলেন।

"কথাটা উল্টো হয়ে গেল। বল, দায় থেকে তুই মুক্তি চাস।"

"অপ্রিয় চিন্তা করো না, বড়দা।"

"সেই সুযোগ তুই-ই দিচ্ছিস তাই করি। তোর কোনো দোষ নেই। সংসারটাই আসলে এমন। এ নিয়ে ভেবে কেউ কোনোদিন কিছু সুরাহা করতে পারে নি। তবে দুঃখটা আমার কোথায় জানিস?" বড়দা ক্রাচ দু'টির উপর হাত রাখলেন। "এই ক্রাচ দু'টি নেবার পর তোর কাছে আমি যে একেবারে মূল্য-হীন হয়ে পড়লাম—সেখানে। আমার কোনো কথাতেই তুই

আর একমত হতে পারিস না !"

মেজদা একটু নীরব থেকে বললেন, "এটা তোমার মনের ভুল। সংকীর্ণতাও বলতে পারো।"

"সংকীর্ণতা !" ম্লান হাসি হাসলেন বড়দা। "ঠিকই বলেছিস !"

বিকেলের দিকে ব্যালকনিতে বসে আছি। মেজদা বাড়িতে থাকলে বড় একটা উপরে যাই না। আজ বড়দা ডেকেছিলেন বলে গিয়েছিলাম। দু'একটা সাংসারিক ফরমাস দিয়ে বড়দা দীনেশকাকার বাড়িতে চলে গেলেন। মা-ও একটু আগে লাল-মোহন সাহার বাড়িতে ভাগবৎ পাঠ শুনতে গেছেন। একটা মাসিক পত্রিকা নিয়ে কখন যে ব্যালকনিতেই জমে গেছি টের পাই নি। বৌদি নীচে টুকটাক কাজ সারছেন আন্দাজ করতে পারছি। মাঝে মাঝে রাজাটার নাক ঘ্যানঘ্যানানী শোনা যাচ্ছে। কোনোকিছুর জন্যে বায়না ধরেছে আর কি!

মেজদার ঘরেও স্নো-পাউডারের কৌটো নাড়াচাড়ার শব্দ শোনা

যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পাট-ভাঙ্গা শাড়ীর খসখসানী। হয়তো প্রসাধন করছে জয়ন্তীবৌদি। দু'একবার গোদরেজ খোলারও শব্দ পাওয়া গেল। নিশ্চয়ই বেরোবে কোথাও।

মেজদার মতো জয়ন্তীবৌদিকেও আমি সুবিধা মতো এড়িয়ে চলি। সংসারে যারা শুধু নিজেদেরই জানে, নিজেদের সুখ-সুবিধাই দেখে, এমন স্বার্থপর মানুষের সঙ্গে আমার মিল খায় না। প্রাণ খুলে যাদের সঙ্গে মিশতে না পারবো, কথা বলতে না পারবো, তাদের থেকে কিছু তফাতে থাকাই ঠিক বলে ভেবেছি। এর জন্যে জয়ন্তীবৌদি আমার সম্বন্ধে যা ইচ্ছে ভাবুক। আমার সম্বন্ধে একটা সুস্থ ধারণা যে তার নেই, এটা আমি কেন, এ-বাড়ির সবাই জানেন।

যেদিন এ-বাড়িতে প্রথম সে পা দিয়েছিল, তার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই আমার মনে হয়েছিল, মেজদার মধ্যে ভাঙ্গনের যে-বীজ সুপ্ত হয়ে আছে, এবার তা অঙ্কুরিত হতে আর বাধা পাবে না। আমার ভাবনা অতিরঞ্জিত কিছুই নয়, এমন হয়। সংসারে এমন কিছু মানুষ আছে যাদের মুখের আদল দেখলেই বোঝা যায়, সব জায়গায় অশান্তির ধ্বজা উড়াতেই যেন তাদের জন্ম।

আমি যাকে পছন্দ করি না, সে-ও আমাকে তাই করে—এমন একটা ধারণা ছোটবেলা থেকেই বিশ্বাস করে আসছি। ধারণাটা যে কতটা সত্যি তারই প্রমাণ আমার আর জয়ন্তীবৌদির সম্পর্ক।

কিছুক্ষণ বাদে জয়ন্তীবৌদির চাপা গলার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল—"বলেছিলে বড়দাকে ?"

"না।"

"না কেন ?"

"কেন আবার, এমনি।"

"ভয়ে ?"

"কী ধরণের ভয়ের কথা বলছো ?"

"ভয়ের রূপ বিশ্লেষণ করতে বসলে নাকি !"

"জয়ন্তী, তুমি ব্যাপারটা যত সহজ মনে করছো, আসলে তা তত সহজ নয়।"

মেজদার গলাটা কিঞ্চিৎ চড়া শোনালো।

আমি যে ব্যালকনিতে বসে আছি, হয়তো দু'জনের একজনও জানেন না। জানলে নিশ্চয়ই তাঁদের নিজস্ব কথাগুলো এমনভাবে আমার কানে আসবার সুযোগ পেতো না। আমার অবশ্য এই পরিস্থিতিতে উঠে যাওয়াই নীতিগতভাবে ঠিক ছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পারলাম না। উঠে গেলে হয়তো আমাদের এই অবক্ষয়ের যে নাটক চলেছে তার এই ক্ষুদ্র ভগ্নাংশটুকু নেপথ্যেই থেকে যেতো।

জয়ন্তীবৌদি প্রায় গর্জে উঠলো—"সেটা সহজ কি কঠিন তোমার বিবেচনার বিষয়, আমার দেখবার দরকার পড়ে না।"

"এমন মাথা গরম করে কিছু হয় না, জয়ন্তী। আমার কথাটা একবার শোন।"

মেজদার গলার স্বর অনেকটা নরম শোনালো।

"আমি কিছু শুনতে চাই না।" একটু থামলো জয়ন্তীবৌদি। "তোমাকে আমি স্পষ্ট বলে রাখছি, বড় জোর একমাস আর আমি দেখবো। তারপর একটা ব্যবস্থা করতে না পারো তো আমি কোন্নগরেই চলে যাব।"

"যেভাবে তুমি আমাকে বলছো, বড়দার সামনে গিয়ে দাঁড়াও, দেখবে কিছুই বলতে পারবে না। কিন্তু বিশ্বাস করো জয়ন্তী, তবুও আমি অনেককিছু বলে ফেলি। শেষে নিজের কাছেই অবাক লাগে

—বললাম কী করে !"

"হোপলেস !"

"সে তুমি যা-ই বলো, সরাসরি আমি ওকথা কিছুতেই বড়দাকে বলতে পারবো না।"

"তুমি তো পারবে না বলেই খালাস। আমি কী করবো বলতে পারো ? এমন একটা আনইজি পজিশনের মধ্যে আমাকে দিনের পর দিন থাকতে বলছো ! অসহ্য ! আমার অসহ্য হয়ে গেছে ! কী করে আমি তোমাকে বোঝাই, কোনো মতেই আমি ওদের সঙ্গে এ্যাড্‌জাস্ট করতে পারছি না। তারপর রয়েছে আর এক আপদ। কখন এসে বাড়িতে পুলিশ হামলা করে তার কোনো ঠিক নেই।"

শেষের কথা ক'টি শুনে একটু নড়ে চড়ে বসলাম। দুঃখের মধ্যেও কিছুটা হাসি পেলো। আমার জন্যে বাড়িতে পুলিশের হামলা হবে—এটাও জয়ন্তীবৌদি তাদের বাড়ি ছাড়ার পেছনে একটা কারণ হিসেবে খাড়া করতে চায় !

মেজদা প্রসঙ্গ পাল্‌টাতে চেষ্টা করলেন—"ফিরতে কি তোমার দেরি হবে ?"

"কী করে বলবো ? তবে ন'টা সাড়ে ন'টা নাগাদ তুমি একটু ষ্টেশনের দিকে যেও।"

"তা যেতে পারি। বাড়িতে তো বসেই থাকবো।"

প্রসঙ্গটা দেখা যাচ্ছে চাপা পড়েই গেল শেষ পর্যন্ত।

"ভালো কথা, আজ কিন্তু ডেট্‌। তুমি একসময় বেরিয়ে পিলের প্যাকেটটা কিনে এনো। অবশ্য তুমি তো ষ্টেশনে যাচ্ছই, তখনই কেনা যাবে।"

"আমি তো চেয়েছিলাম লাল ত্রিভুজটা এ-মাস থেকেই

উঠিয়ে দেবো।"

"যক্ষে কবো। এখনো অনেক বাকি। হলেই তো হলো। তার আগে ঝাড়া হাত-পায়ে একটু ঘুরে ফিরে নিই।"

"খুব লেট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, জয়ন্তী।" কিছুটা আব্দারের সুর শোনা গেল মেজদার গলায়। "ঠিক আছে, আর একমাস সময় গ্রান্ট করলাম।"

"সে দেখা যাবে।"

পায়ে চটি গলানোর শব্দ শোনা গেল। এক্ষণি বেরোবে হয়তো। আর এখানে বসে থাকা ঠিক হবে না। কিন্তু এই উঠে যাওয়ার মধ্যে যেন কেমন একটা নীচতার মানসিকতা রয়েছে। মনকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, আমি তো ইচ্ছে করে কারো কথায় আড়ি পাতি নি। তবে এতো সংশয় কেন?

শেষ পর্যন্ত বইয়ের মাঝে মুখ গুঁজে বসেই রইলাম।

জয়ন্তীবৌদি মেজদাকে জিজ্ঞেস করছে, "তাহলে দাদাকে বলবো কাল তোমার সঙ্গে অফিসে দেখা করতে?"

"কাজটা কি ঠিক হবে, জয়ন্তী?"

"বেশ, তোমার যখন ইচ্ছে নেই, বলবো না। দাদা তো আর নিজে তোমাকে কিছু বলেন নি, আমিই তাঁর হয়ে বলেছিলাম—যদি এ-সময়ে একটু সাহায্য করতে পারো। এভাবে তোমার কাছে সাহায্য চাওয়ার মধ্যে কোনো গৌরব নেই জানি। দাদা হয়তো মনে মনে নিজেকে অনেক ছোটই ভাববেন। তবু তাদের সংসারের দিকে চেয়ে তোমাকে এ অনুরোধটুকু করেছিলাম।"

"ডোণ্ট টেক্ আদারওয়াইজ, জয়ন্তী। ব্যাপারটা তুমি অন্য রকম ভাবে নিও না। সুজন আমার বন্ধু, তারপর তোমার দাদা। আজ সে চাকরি হারিয়ে, তা যেভাবেই হারিয়ে থাকুক, বন্ধু হিসেবে

তার পাশে আমার দাঁড়ানো উচিত। তার জন্যে কিছু একটা করা উচিত—সে আমার বিজনেসে জড়িয়েই হোক বা অন্য কোথাও চেষ্টা করেই হোক।"

"তাই যদি বোঝ তবে এতো কথা কেন?"

"আমার কথাটা কিন্তু শেষ হয় নি, জয়ন্তী।"

"বলো।"

"তুমি বলছো তাকে আমার অফিসে বসিয়ে দিতে। তা আমি পারি। সেল্স্ ম্যান হিসেবেও এখানে সেখানে পাঠানো যায়, কাজও হয়তো ভালোই পাওয়া যাবে। কিন্তু বাধাটা কোথায় জানো?"

"তোমার ইচ্ছে নেই—সে এক কথা। কিন্তু বাধার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।"

"জয়ন্তী, যে প্রশ্নটা এখানে সবচেয়ে বড়, হয়তো যার কোনো উত্তরই আমি দিতে পারবো না—সেটা কী জানো? তরুণ ইজ নট মাই ব্রাদার-ইন-ল। সে আমার ভাই। মায়ের পেটের ভাই। তাকে কিন্তু আমি আমার অফিসে বসাতে চাই নি। কেন চাই নি? সুজনকে বসালে এ-প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক জবাব দেয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব?"

জয়ন্তীবৌদি কোনো উচ্চবাচ্য করলো না। হয়তো সমস্যাটা নিয়ে তলিয়ে ভাবছে। এদিকে ব্যালকনিতে বসে আমিও ভাবছি। ভাবতে ভাবতে মনে হয়েছে—সুজন চ্যাটার্জিই হয়তো শেষ পর্যন্ত চাকরিটা পেয়ে যেতে পারে।

মেজদা বললেন, "আজই তোমার কিছু বলবার দরকার নেই। আমাকে একটু ভাবতে দাও।"

কথার মধ্যে কিছুটা সান্ত্বনার সুর পাওয়া গেল। অবশ্য বলার

ভঙ্গীতেই কেবলমাত্র সেটা বোঝা গেছে।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার টানার শব্দ।

"পাঁচটা নিয়ে যাও।"

টাকা তো বটেই। অন্য আর কী বস্তু ড্রয়ারে থাকতে পারে ? এখন পাঁচ টাকাও অনুমান করা যায়, পঞ্চাশ ভাবতেও খুব অসুবিধে হয় না। তবে ঐ শেষের সংখ্যাটিই হবে। কারণ বাপের বর্তমানে একমাত্র সম্বল পেনশনের টাকা। মাথার উপর অনেকগুলো পোষ্যি। বড় ছেলে সুজনও বর্তমানে আমার স্বগোত্রীয়। তার চাকরি থাকতে এদিক ওদিক করে চলে যেতো। পুরো বেতনেও প্রায় সবারই যেখানে আজকালকার বাজারে সংসার চালানো দায় হয়ে পড়ে, সেখানে পেনশনের টাকায় এতগুলো পোষ্যির পেট ভরবে একথা ভাবাই যায় না। পরিস্থিতিটা খুব সুবিধাজনক নয় বলেই মনের মধ্যে একটা বেআইনী চিন্তা উঁকি দিয়ে গিয়েছিল।

জয়ন্তীবৌদি দরজায় পা দিয়েই ব্যালকনিতে আমাকে বসে থাকতে দেখে একটু থমকে দাঁড়ালো। কিছুটা অপ্রস্তুতের মতোই মনে হলো। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে টক্ টক্ জুতোর আওয়াজ তুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

মেজদাও একটু পরে দরজায় এসে দাঁড়ালেন। এক ঝলক্ তাকিয়ে দেখলাম। মুখটা যেন কেমন একটু পাংশু। অনুমান করতে পারি, একটা কঠিন আবর্তের মধ্য দিয়ে দিগ্‌ভ্রান্তের মতো পথ চলতে হচ্ছে মেজদাকে।
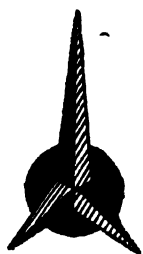
সন্ধ্যার কিছু পরে বড়দা ফিরে এসে অন্ধকার ব্যাল-কনিতে একটা ইজি চেয়ারে আধ-শোয়া অবস্থায় চোখ বুজে পড়েছিলেন।

আমি বড়দার ঘরে বসে রাজাকে মুখে মুখে ছড়া শেখাচ্ছিলাম। নীচে বৌদিকে জ্বালাতন করছিল। তাই বৌদি বললেন, "যাও তো ছোটঠাকুরপো, একে একটু উপরে নিয়ে যাও। শান্তিতে কাজ করার জো নেই, ভীষণ জ্বালাচ্ছে।"

কিছুক্ষণ পরে নীচ থেকে বৌদি জলখাবার আর চা নিয়ে এলেন। বড়দার পাশে গোল টেবিলটার উপরে সেগুলো রেখে সুইচ টিপে ব্যালকনির আলোটা জ্বালালেন।

"অন্ধকারে বসে আছ, মশায় কামড়াচ্ছে না?"

"তা দু'চারটে কামড়াচ্ছে বৈ কি!"

"দু'চারটে কী বলছো, আমি তো দেখছি দু'চার ব্যাটেলিয়ান

তোমাকে ঘিরে ধরেছে।"

রাস্তার আলো থেকে একফালি আলো এসে পড়েছিল ব্যালকনিতে। বড়দা অনেক সময় ঐ আলোটুকুও এড়াবার জন্যে কায়দামত জায়গায় চেয়ার টেনে কিছুটা অন্ধকারেই বসে থাকেন। তখনই বুঝতে হবে, তাঁর মনের অবস্থা খুবই খারাপ। গভীর কোনো চিন্তা অথবা বেদনা মনে আসলেই এমন করেন।

দরজা বরাবর ঘরের দেয়ালে বাবার একটা ফটো ঝুলানো। যেন জ্বল্ জ্বল্ করে তাকিয়ে আছেন। মনে হয় কী যেন বলতে চান। একটা শাসনের দৃষ্টি চোখ দু'টিতে। বাবা যেন বড়দার দিকেই তাকিয়ে বলছেন—তুমি পারলে না, অরুণ। আমার আশা, আমার স্বপ্ন, আমার মতবাদ সার্থক হলো না। তুমি সম্পূর্ণই ব্যর্থ হতে চলেছ।

একটা চেয়ার টেনে বসলেন বৌদি। বড়দা ততক্ষণে খেতে শুরু করেছেন। দু'এক টুকরো রুটি মুখে দিয়ে বললেন, "বরুণের এই উদ্ধত ভাবটা আজকাল আমাকে খুব কষ্ট দেয়, সুমি।"

বৌদি মুখ নীচু করে চায়ের কাপে চিনি মিশিয়ে দিচ্ছেন। কোনোরকম প্রত্যুত্তর দেওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না।

"আগে মনে করতাম, ছেলেমানুষ, কী বলতে কী বলে। কিন্তু আজকাল যেন সবকিছুই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। একটা বেপরোয়া ভাব। এটা কি ঠিক?"

"কেন তুমি এসব নিয়ে মন খারাপ করছো? তোমার কাছে যেটা বেঠিক, অন্যের কাছে তো তা না-ও হতে পারে!"

"তাহলে তো কোনো কথাই নেই!"

রাত্রি প্রায় দশটার সময় গেটের সামনে একটা রিক্সা এসে থামে। জানালাটা একটু ফাঁক করে দেখলাম। বৌদিও হয়তো

উপর থেকে লক্ষ্য করেছেন। বড়দাও হয়তো বসে বসে বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছেন মেজদার অপেক্ষা করে করে।

রিক্সায় বসেই ভাড়া মেটানো হলো। ভাড়াটা আগেই পকেট থেকে বের করে রেখেছিলেন হয়তো। রিক্সা থেকে নেমে গেটের সামনে দাঁড়িয়েই দু'জনে খুব নীচু গলায় দু'চারটে কথা সেরে ভেতরে ঢুকলেন।

বৌদি বড়দাকে অনেকবার বলেছেন খেয়ে নিতে। না. বরুণ এলে একসঙ্গেই খাওয়া যাবে। রবিবার দুপুরে ছাড়া একসঙ্গে বসে বড় একটা খাওয়া হয় না। অন্যান্য দিন মেজদার বাড়ি ফেরবার কোনো ঠিক থাকে না। বড়দাও স্কুল থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি আসেন। কোনো কোনোদিন মেজদা সকাল সকাল এলেও ঠিক সকাল সকাল খেতে চান না। তাই একসঙ্গে বসে খাওয়ার পাটটা উঠে গেছে অনেকদিন। রবিবারদিনও প্রায়ই বিকেলের দিকে মেজদা আর জয়ন্তীবৌদি বেরিয়ে যান। অধিকাংশ দিনই বাইরে থেকে খেয়ে আসেন। বড়দা এরজন্যে রাগারাগি করতেন, এখন আর কিছু বলেন না। অনেকবার বলে দেখেছেন, কোনো কাজ হয় নি। বাবার সময় থেকে প্রচলিত হয়ে আসা এই একসঙ্গে বসে খাওয়ার নিয়মটাকে বাঁচিয়ে রাখতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন বড়দা। এটা একটা শিষ্টাচারের ব্যাপার। পরিবারের একজনের জন্যে যে আরেকজন অনুভব করে—এমনই একটা মানসিকতা প্রকাশ পায় এর মধ্য দিয়ে।

মেজদা একদিন বলেছিলেন, "তুমি তো খেয়ে উঠতে পার। কেন অযথা বসে থাকো?"

এমন ধারায় বলেছিলেন মেজদা, যেন বিরাট একটা অপরাধ করে বসেছিলেন বড়দা।

"এর সঙ্গে গল্প করতে করতে খাব—এই আর কি !"

কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে, আবার কিছুটা যেন অপরাধীর মতো বলেছিলেন বড়দা। হয়তো মুহূর্তে ভেতরের নরম স্থানটিতে মৃদু স্পন্দনও জেগেছিল। হাঁটু থেকে বাদ দেওয়া পা-টার দিকে দৃষ্টি পড়েছিল একবার।

সন্ধ্যার পরই বেরিয়ে গিয়েছিলেন মেজদা। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় মতো ষ্টেশন থেকে জয়ন্তীবৌদিকে নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

বৌদি চাবি নিয়ে নীচে গেলেন। বারান্দার কোলাপ্‌সিবল্ গেটে তালা দেওয়া রয়েছে। আগে শোবার সময় দেওয়া হতো। কিছুদিন ধরে বৌদি অফিস থেকে এসেই সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে তালা ঝুলিয়ে দেন। বাইরের কেউ এলে লোক বুঝে খুলে দেওয়া হয়। নিজেদের লোকের মধ্যে মেজদা ছাড়া সাধারণতঃ বাইরে তখন আর কেউ থাকেন না। মেজদা এলে বৌদিই চাবি নিয়ে ছুটে যান।

বৌদিকে বলেছিলাম, "এটা আবার তোমার বাড়াবাড়ি, বৌদি। ভীষণ ভীতু তুমি। আমাকে কি ওরা ঘর থেকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলবে ?"

মেজদা আর জয়ন্তীবৌদি উপরে উঠে গেলে বৌদি খাবার ঘরে গেলেন। এখনো কম করে পনেরো মিনিট অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে তাঁকে। বড়দাও লক্ষ্য রাখবেন, মেজদার হলো কিনা।

মা ন'টার সময় রাজাকে ঘুম পাড়িয়ে নিজেও শুয়ে পড়েছেন। আজকাল ঠাকুরমাকে ছাড়া রাজা শুতে চায় না। বৌদি অফিসে চলে গেলে দিনের অধিকাংশ সময়ই ঠাকুরমার সঙ্গে কাটায়। এর জন্যেই হয়তো ওর মানসিকতায় ঠাকুরমার প্রভাবটা খুব বেশী

পড়েছে।

আমি খেয়ে নিয়েছিলাম মা শুয়ে পড়বার পরই। মাকেও ডাকাডাকি করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি খাবেন না জানিয়েছেন। মা প্রায়ই রাত্রিতে খেতে চান না। বিকেলের দিকে নাকি অম্বল হয়।

খাওয়া-দাওয়ার মতো প্রয়োজনীয় কাজগুলো আমি আজ-কাল চুপি চুপি সেরে ফেলি। কোনো দুঃসম্পর্কের আত্মীয়বাড়িতে উপযাচক হয়ে খুব বেশীদিন কাটালে অবস্থাটা যেমন হয়, আমারও যেন তেমন একটা বোধ মাঝে মাঝে মাথায় চেপে বসে।

মেজদাকে আমি সযত্নে খাবার টেবিলে এড়িয়ে চলি।

শ্রীরামপুর ষ্টেশনে সেদিন হঠাৎ এক স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নাম অসিত। অসিত পাল। হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে এল. সি. পড়েছিল। এখন সি. এম. ডি. এ-র কণ্ট্রাকটরী করে। এদিকে কোথায় যেন নালা-নর্দ্দমা খুঁড়বে বলে এসেছে। একটা চায়ের দোকানে বসে কিছু কথা হয়েছিল তার সঙ্গে। আমি এখনো ব্যারেণ্ডা বাজাচ্ছি শুনে উৎসাহ দিয়ে বললো, "আমার সঙ্গে নেমে পড় না, অবশ্য যদি তোর আপত্তি না থাকে। বড় বড় কাজগুলো আমার একার পক্ষে নেয়া অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না।"

অসিত কী বলতে চাইছে বুঝতে পারলাম। তখনই তাকে চূড়ান্তভাবে কিছু বলা গেল না। বড়দা-বৌদির সঙ্গে পরামর্শ দরকার। শুধু জানিয়ে দিলাম, "আমার ষোল আনাই ইচ্ছে আছে, অসিত।"

রাত্রিতে একটা সুবিধামতো সময়ে বৌদিকে বললাম, "কিছু টাকা হলে একটা কাজ করা যেতো।"

"কী কাজ ?"

বৌদি জানতে চেয়েছেন।

"ঐ রাস্তা-ঘাট খোঁড়াখুঁড়ির ব্যাপার আর কি। সি. এম. ডি. এ,—"

"কণ্ট্রাকটরী করবে ?"

"ওরকমই একটা কিছু ধরে নাও। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ঐ করছে।"

"কত টাকা লাগবে ?"

"সে এখন কী বলব।" একটু চিন্তা করে বললাম, "ধরো পাঁচ সাত হাজার।"

বৌদি কিছু বললেন না। বলতে পারলেন না। এই বলতে না পারার বেদনা যে কতখানি, তা তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারলাম।

যাবার সময় আমিই বললাম, "তার জন্যে দুঃখ করো না, বৌদি। আমি তো সবই জানি।"

আমার কোনো ব্যাপার নিয়ে মেজদার সঙ্গে আলোচনা হোক —এটা আমার পছন্দ নয়। এ-পর্যন্ত অনেক কথাই তো হয়েছে। অবশ্য কথা না বলে কথা কাটাকাটি বলাই ঠিক। কিন্তু বড়দাকে কে বোঝাবে ? তিনি যথারীতি মেজো ভাইয়ের সঙ্গে আমাকে উদ্ধার করতে বসে গেলেন।

বৌদিকে ডেকে বললাম, "কেন তুমি ওসব বলতে গেলে ? ও কাজের কি ঠিক আছে কিছু ?"

"তুমি কাল বলছিলে—তাই।"

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? ওসব কাজের আমি বুঝি কিছু ? শেষকালে টাকা পয়সা ঢেলে একটা চোট্ খাই, আর তোমরা সবাই মিলে বাড়ি থেকে বের করে দাও ! রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে অনেক ভেবেছি, যা ঠিক বুঝি না তা নিয়ে লাফালাফি করে লাভ নেই।"

ওদিকে বড়দার মুখে কথাটা শুনে মেজদা জানতে চাইলেন, "তুমি কী করতে বলো ?"

"আমি আর কী বলবো। তুই যা ভালো বুঝিস।"

"খুব কমপিটিটিভ কাজ।"

"কমপিটিশন তো এখন সবকিছুতেই। চাকরি বলিস—ব্যবসা বলিস—কিসে না ! বলতে পারিস আজ পর্যন্ত কোনো জায়গায় তোর একারই কেবল কোটেশন পড়েছে ?"

"দেখো, আমার কোনো আপত্তি নেই, তবে টাকাগুলো বার করে দেয়ার আগে একবার ভেবে দেখা উচিত। যার সঙ্গে কাজ করবে তাকেও আমরা ঠিক জানি না। ভালোও হতে পারে, তবে খারাপদিকটার কথাই আগে ভাবা দরকার।"

"খোঁজখবর তো নিতেই হবে। একজন এসে কী বললো আর আমরা তাই শুনে ভালোমন্দ না ভেবে একটা কিছু করে বসবো —তা কি হয় ?"

"তুমি বলছো, ছেলেটি তরুণের স্কুলের বন্ধু। অনেকদিন পরে দেখা। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকলে এমন প্রপোজাল সে কিছুতেই দিতে পারে না। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই, বড়দা। আমার চিন্তা-ভাবনা তো তাই বলে। এবার তোমরা কী করবে ভেবে দেখো।"

বড়দা খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "তুই যখন ব্যাপারটা

ঠিক সুবিধের মনে করছিস না—তখন ও নিয়ে আর ভেবে কাজ নেই।"

"তোমরাও ভেবে দেখো।"

"থাক বরুণ, তাকে নিষেধই করে দিতে বলবো। আমিও ব্যাপারটা ঠিক সুবিধের মনে করছি না। কথা নেই বার্তা নেই—একেবারে এমন একটা প্রপোজাল দিয়ে দিলো? নিশ্চয়ই ভেতরে কিছু গলদ আছে।"

"শুধু একটা দিকই বিচার করো না।"

মেজদা কী বলতে চাইলেন বুঝতে কিছুই অসুবিধে হয় না। মনে হয়েছিল, সামনে এসে দাঁড়িয়ে কিছু বলি। বললেই একটা বিরাট অশান্তি হবে, সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলাম। আমি আমার জন্যে ভাবছি না ভাবছি বড়দার জন্যে। আমার থেকে বড়দাই কথা শুনবেন বেশী। কষ্টও তাঁরই বেশী হবে।

মেজদা কিন্তু সেখানেই থেমে থাকলেন না। দরকার হলেও টাকা-পয়সা যে এ-সময়ে বের করতে পারবেন না প্রকারান্তরে সেটাও জানিয়ে দিলেন। বললেন, "যে পরিমাণ টাকার কথা বলছো, সেটাও একটা ভাবনার বিষয়। আমার অবস্থা তো বলতে গেলে একরকম অচলই। ছ'মাস ধরে কোনো বিলের পেমেণ্ট নেই। অথচ এ্যাডভান্স দিয়ে মাল করাতে হয়। কী করে যে বিজনেস চলবে তাই ভাবছি।"

"বলিস কী! ছ'মাস ধরে কোনো পেমেণ্ট পাচ্ছিস না?" বড়দা বিস্মিত হয়ে বললেন।

"বিজনেসের হাল-চাল আজকাল এমনই দাঁড়িয়েছে। সবাই বলছে, মাল দাও। কিন্তু টাকার বেলায় মুখ ঘুরিয়ে থাকে।"

"হঠাৎ এমন হলো কেন?"

বড়দা জানতে চাইলেন।

"ব্ল্যাক্ মানি। বিজনেস ম্যানেরা সরকারের ভয়ে ব্ল্যাক্ মানি সব সরিয়ে নিচ্ছে বিজনেস থেকে। যে-দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ফিপ্‌টি পারসেণ্ট ব্ল্যাক্ মানিতে চলে সে-দেশে তো এমন হবেই।"

"কিন্তু এমন হলে কী করে চলবে? কতদিন আর মানুষ ঘর থেকে টাকা বের করে চালাতে পারে?"

"চলছে আর কোথায়! আমার মতো ছোটখাটো পার্টিদের অবস্থা খুবই খারাপ। লাস্ট ইয়ারে যা সাপ্লাই করেছিলাম, এবার তার হাফ করতে পারবো কিনা সন্দেহ।"

বলে মেজদা কী একটা কাজে উঠে গেলেন।

"বড়ঠাকুরপোর কাছে ওসব কথা না বললেই পারতে।"

বৌদি এসে অনুযোগ দিলেন।

"ওর সঙ্গে কথা না বললে চলবে কেন?"

বড়দা মনে হয় পছন্দ করলেন না বৌদির কথাটা।

"বলে কিছু ফল পেয়েছো?"

"আমার বলা উচিত, বলেছি।"

"কোন্‌টা উচিত কোন্‌টা অনুচিত—এসব তো অনেকদিন ধরেই দেখে এলে।"

রাগ নয়, অভিমানই যেন প্রকাশ পেলো বৌদির গলায়।

"তবুও একান্নবর্তী পরিবারে এর একটা মূল্য আছেই, সুমি। আমি বুঝি, বরুণ কী বলে গেল। শুধু বরুণ কেন, অনেকেই এমন বলে কিন্তু একসঙ্গে থাকতে গেলে তাদের বাদ দিয়েও কি কিছু করা যায়? বলো? যায় করা? যায় না।"

এরপর বৌদি আর কিছুই বললেন না। লক্ষ্য করলাম মুখে তাঁর সামান্য বেদনার আভাস। বড়দা তো কাউকে আঘাত দিয়ে

কথা বলেন না।

বৌদি চলে যাচ্ছিলেন। ডাকলেন বড়দা।

"স্থমি, শোন। রাগ করেছো?"

"না।" বিষণ্ণ মুখে জানালেন বৌদি। "রাগ করবো কেন? কোনোদিন করতে দেখেছো?"

"তবে?"

বৌদি একটু নীরব থেকে বললেন, "জানো, তোমার সারল্যের স্থযোগে কেউ যখন চরম মিথ্যেকে পরম সত্য বলে বোঝাতে আসে তখনই আমার সবচেয়ে বেশী দুঃখ হয়। মনে হয়, তুমি শুধু ভুলই করে যাচ্ছ দিনের পর দিন।"

বড়দা মৃদু হাসলেন। বললেন, "সব জেনেশুনেও গোটা সংসারের জন্যে তুমি যে এতো খাটছো—সেটাও কি তাহলে ভুল?"

"জানি না।"

অস্ফুট উচ্চারণ করলেন বৌদি।

রান্নাঘরে বৌদি আর মা কথা বলছেন।

মা'র গলা শোনা গেল, "তোমরা যদি না বলতে পারো আমিই বলবো।"

"কী হবে মা বলে?" বৌদি আপত্তি করলেন। "আপনার বড় ছেলে তো একদিন বলেছিলেনই। কেন একটা সোজা কথা বুঝতে পারেন না—বড় ঠাকুরপো তার ব্যবসায় কাউকে ঢোকাবে না।"

"কেন বলতে পারো, বৌমা?"

"আমি কী বলবো? আপনি কি বুঝতে পারেন না?"

"পারি। খুব পারি। কিন্তু অরুণের কথা সে অমান্য করে কোন্ সাহসে?"

"এটা আর এমন কী কথা! কতই তো দেখছি শুনছি। এর জন্যে আপনার বড় ছেলে আর কিছুই মনে করেন না।"

"সবই আমার কপাল, বৌমা! বরুণ যে এমন অমানুষ হবে স্বপ্নেও ভাবি নি। তোমরা তো তার জন্যে কম করো নি? অরুণ তার সর্বস্ব দিয়ে দিলে। তোমার গয়নাগুলো পর্যন্ত ধরে ধরে হাতে তুলে দিলে, কই, একটাও তো আর ফিরে এলো না? তোমরা যদি তখন হাত গুটিয়ে বসে থাকতে, কী করতো সে? সে-সব কথা কি সে একেবারে ভুলে গেছে!"

"থাক্ মা, যা গেছে ও যেতেই দিন। ও নিয়ে কথা বললে অশান্তি বাড়বেই, কমবে না। তাছাড়া আপনার বড় ছেলেকে তো জানেন, শুনলে ভীষণ রাগ করবেন।"

মেজদার জন্যে হরলিক্স করতে জয়ন্তীবৌদি ঠিক সেই সময় রান্নাঘরে আসে। দু'একটা কথার টুকরো তার কানে গিয়ে থাকবে।

এ সমস্ত আলোচনা বৌদি একেবারেই পছন্দ করেন না। খুব সংকুচিত মনে হলো তাঁকে। ছি! ছি! কী লজ্জার ব্যাপার। জয়ন্তী কী মনে করেছে!

হিটারে কেটলি বসিয়ে সুইচটা টিপে দিয়ে বৌদির দিকে একবার তাকিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইলো জয়ন্তীবৌদি। কিছুক্ষণ পরে বললো, "দিদি, যা বলতে চাও ওকে গিয়ে পরিষ্কার ভাবে বললে ভালো হয় না?"

বৌদি শুধু একবার তাকিয়ে মুখ নীচু করে নিজের কাজ করতে লাগলেন।

মা বলে উঠলেন, "বললে সব সহ্য করতে পারবে তো?"

"যে অবস্থায় পড়েছি, সহ্য না করে উপায় কী বলুন?"

"অবস্থাটা যদি নিজেরা তৈরি করে নাও, তার দায় তো অন্যের নয়, মেজোবৌমা।"

জয়ন্তীবৌদি কোনো কথা বললো না। হয়তো বলবার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছিল না। শেষে চলে যাবার সময় বললো, "আপনাদের যা বলবার আছে, তা গিয়ে ওখানেই বলুন— আপনার ছেলের কাছে। নিজেরা এ ভাবে কানাকানি না করে ওখানে গিয়ে বললে লাভ হবে।"

"দাঁড়াও!" মা যেন প্রায় গর্জন করে উঠলেন। "নিজের লাভের দিকে তাকিয়ে সংসারে অনেকেই অনেক কিছু করে না, এ-কথাটা বোধ হয় ছোটবেলা থেকে শোন নি কোনোদিন। সবাই যদি লাভের দিকে তাকাতো তাহলে অরুণ তোমাদের কথা ভেবে দিনের পর দিন নিজেকে এ ভাবে ক্ষয় করে দিতো না। দুঃখ আমার এখানেই, কোনোদিন তোমরা তাকে বুঝলে না, বুঝতে চেষ্টা করলে না। ভেবেছো, ওর চোখের জল ওর নিজের দুর্বলতা। তা নয়, মেজোবৌমা, তা নয়। কিসে লাভ, কিসে লোকসান হয় —সংসারে তার কতটা দেখেছো!"

মা'র গলাটা শেষের দিকে ভারি হয়ে আসে, "মেজোবৌমা, জমিতে ভালো ফসল ফলাতে গেলে জমির অনেক যত্ন নিতে হয়। অনেক খাটতে হয়। তবে ভালো ফসল পাওয়া যায়। এ-বাড়িতে এসে তৈরি জমির ফসলটা পেয়েছো, কোনোদিন তো দেখোনি এর পেছনে কতজনের কত পরিশ্রম ছিল!"

বলে মা একমুহূর্ত সেখানে না দাঁড়িয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

বৌদি নির্বাক হয়ে সব শোনলেন। ইচ্ছে করলে জয়ন্তী-বৌদিকে অনেক কথাই বলতে পারতেন। বলবার মতো অনেক কথা তাঁর ছিল। বললে অশান্তি হবে, এই ভয়ে সব সময়ই সব সহ্য করে যান। মুখ বুজে সংসারের জন্যে অমানুষিক খাটুনি

াটেন।

বড়দা বলতেন, "কোমর বেঁধে ঝগড়া করে কিছু হয় না, ?মি। ওতে অশান্তি আরো বাড়ে। ঝগড়া করে কাউকে ংশোধনও করা যায় না। তোমার কাজ তুমি করে যাও, শান্তি াবে।"

জয়ন্তীবৌদির সঙ্গে আমি কথা বলি না। এটা বৌদির ইচ্ছে য়। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "জয়ন্তীর সঙ্গে কথা বলো । কেন? ও কী মনে করে?"

"কিছু মনে করবার মতো মন আছে নাকি তোমাদের মজোবউয়ের?"

"ওর সঙ্গে কথা বলো, আমার ভীষণ খারাপ লাগে। হয়তো াবে আমরা শিখিয়ে দিয়েছি।"

"ভাবে তো অনেক কিছুই।"

"তবুও তোমার কথা বলা উচিত।"

"মন থেকে যার জন্যে কোনো তাগিদ পাই না তা আমি রতেও পারি না।"

"কিন্তু আমি যা সে-ও তো তোমার তাই।"

"হাসালে বৌদি। তুমি যা, সে-ও আমার তাই! মেজদাকে িজ্ঞেস করে দেখো তো—মেজদা তার কতটা? আসলে বাপের ড়িই তার সব। মেজদা তো আছেন একটা ঘোরের মধ্যে।"

আমার তাই মনে হয়। মেজদার কার্যকলাপ তাই প্রমাণ রছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব বলতেও এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। জেকে পুরোপুরিই জয়ন্তী বৌদির হাতে সঁপে দিয়েছেন। দিতে ধ্য হয়েছেন। একে তো প্রেমের বিয়ে, তার উপর জয়ন্তীবৌদির দ্ধির প্রখরতা মেজদার চেয়ে অনেক বেশী। সেই কারণেই এটা

সম্ভব হলো। অনেক ক্ষেত্রেই এমন হতে দেখা যায়। স্ত্রীর অনুগত না হলে দাম্পত্যজীবনে দেখা দেয় অশান্তি। এই অশান্তি এড়াতে নিজের অজান্তে অনেকেই তখন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে স্ত্রীর কব্জাগত হয়ে পড়ে।

নিজের বিছানায় অলসভাবে পড়েছিলাম। বৌদি ময়লা জামাকাপড় নিতে ঘরে এসেছিলেন। হীরুরমা সপ্তাহে একদিন কাচাকুচি করে দেয়। সেদিন দুপুরের খাওয়াটা বেশ ভালোভাবে এখান থেকে সেরে যায়। কলাই করা থালায় গামছা বেঁধে বাড়িতেও নিয়ে যায় হীরুর জন্যে।

বৌদিকে বললাম, "মাকে মানা করো। মেজদার কাছে গিয়ে কোনো লাভ নেই। নো ভেকেন্সি।"

"মানে?"

"চাকরিটা হয়তো অন্য কেউ পেয়ে গেছে।" মৃদু হাসলাম "বুঝলে না? মেজদার অফিসের চাকরিটা। আরেকজন কেণ্ডিডেট ছিল। তারই হয়েছে হয়তো কারণ ব্যাকিং এর জোরটা আমার থেকে তার অনেক বেশী।"

বৌদি কিছু বুঝতে পারলেন না বোধ হয়। না বোঝারই কথা। হেসে বললাম, "বুঝলে না তো! আমি তো আর বউয়ের ভাই নই, নিজের ভাই। এটাই আমার সবচেয়ে বড় ডিস্‌কোয়ালিফিকেশন।"

উঠে বসে বললাম, "বৌদি, বড়দাকে যেন একথা বলো না। শুনলে হয়তো বড় আঘাত পাবেন।"

বৌদি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে রান্নাঘরের সামনে মেজদার উত্তেজিত গলা শোনা গেল। জয়ন্তীবৌদি গিয়ে লাগিয়েছে।

"এই যে বৌদি, তোমরা কি চাও এ-বাড়ি থেকে আজ

আমরা চলে যাই ? যদি এই তোমাদের ইচ্ছে হয়, স্পষ্ট করে বলে দিলেইতো পারো।"

"কী হয়েছে বলো তো ?"

বৌদির শান্ত স্বর।

"তুমি জানো না কী হয়েছে ? আবার জিজ্ঞেস করছো ? আর কত বলবে, বৌদি ? বাড়ির সবাই মিলে একসঙ্গে যদি এভাবে উৎপাত শুরু করে দাও তাহলে তো দেখছি একদিনও আর এখানে থাকা যায় না।"

"এই ! উৎপাত কীরে ইডিয়ট ?" বড়দা বাইরের বারান্দার দিকে ছিলেন হয়তো। মেজদার চেঁচামেচি শুনে সেখানে এসে দাঁড়ালেন। "যা, তোর ইচ্ছে না হয়, এক্ষনি চলে যা। আমি অনেক দেখেছি, তোর অনেক বেয়াদবি সহ্য করেছি, কিন্তু সব-কিছুরই একটা সীমা আছে। তুই যেখানে ইচ্ছে যেতে পারিস, তবু তুই শান্তিতে থাক। তুই না দেখলে আমরা যদি না খেতে পেয়ে মরে যাই, তবু তোর কাছে যাব না—তুই নিশ্চিন্ত থাক। একটা দিন তুই আমাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছিস না, কী অপরাধ আমি করেছি বলতে পারিস ? কী এমন অপরাধ !"

"তুমি আবার এখানে এলে কেন ? চুপ করো তুমি।" বৌদি বিস্মিত হয়ে গেলেন। কোনোদিন এমন ভাবে বড়দাকে কথা বলতে দেখেন নি। "ছি ! ছি ! এসব তুমি কী কথা বললে ?"

বড়দা খানিকক্ষণ ক্রাচে কপাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে উপরে চলে গেলেন।

মা কিছু বলবেন মনে করেছিলাম। কিন্তু ঘর থেকেও বেরিয়ে এলেন না।

মেজদা আর একটু আস্ফালন করলেন, "যদি বোঝায় বোঝা টাকা তোমাদের সংসারে ঢালতে পারতাম তাহলে তোমাদের সবার কাছে খুব ভালো হতে পারতাম।"

"কথাটা আবার বল বরুণ।"

মা'র ঘরের দরজাটা খুলে গেল। "বলতে তোর মুখে একটুও বাধলো না!"

"যা সত্যি তাই বলেছি।"

মেজদার মধ্যে যেন একটা মরিয়া ভাব।

"ছি! ছি! বরুণ। তোর এত অধঃপতন হয়েছে।"

মা ধিক্কার দিলেন।

মেজদা উপরে উঠে যাচ্ছিলেন। মা ডাকলেন, "দাঁড়া। এত কথাই যখন বললি, তাহলে আজ আমাকেও কিছু বলতে দে।"

"বলো।"

"জানি, গায়ের চামড়াটা এরই মধ্যে অনেক শক্ত করে নিয়েছিস তাই এভাবে কথা বলতে আর লজ্জাও হয় না। কোথায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিস সে-খেয়াল তোর আছে? এ-বাড়িটা অর্দ্ধেকের বেশী অরুণের টাকায় তৈরি হয়েছে—সে-খবর রাখিস?"

"আমি তার প্রত্যাশী নই।"

"আর অরুণ বুঝি তোর টাকার প্রত্যাশী? একথা তুই ভাবলি কেমন করে? কার জন্মে আজ এমন বুক ফুলিয়ে কথা বলতে পারছিস তা একবার চিন্তা করেছিস? কে দিয়েছিল তোর ব্যবসার পুঁজি? তোর শ্বশুর-বাড়ির লোক, না অরুণ? আজ সে অচল হয়ে পড়েছে, তবু তোর কাছে তো হাত পাতে নি। নিজের বৌকে চাকরিতে লাগিয়েছে—তোর বাবা যেটা পছন্দ

করতেন না। কিন্তু তুই তার জন্যে কী করেছিস? বলেছিস একবার, বড়দা, বৌদি কেন চাকরি করবে, আমি তো আছি। একথা একবার বলেছিস? তোর ধারণা, ওরা তোর টাকা বসে বসে খাচ্ছে, না?"

"আপনি ঘরে যান, মা।"

বৌদির ভেতরে কিছুটা অপ্রস্তুত আর অস্থির ভাব:

"আমাকে আজ কিছু বলতে দাও, বৌমা।"

"না, কিছুই বলতে হবে না আপনাকে।"

"আরও শুনে রাখ, তরুণকে কেন তুই ব্যবসায় নিতে চাইছিস না তাও আমার আর বুঝতে বাকি নেই। তোর বিরাট ভয়—যদি সে তোর অংশীদার হয়ে দাঁড়ায়।"

"এবার তাহলে একটা নোটিশ করে দাও, যাতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাই।"

"ওটাই তো চাস। ডানায় আজ জোর হয়েছে, এখানে পড়ে থেকে কষ্ট করবি কেন!"

বৌদি মাকে জোর করে ঘরে নিয়ে গেলেন।

রাজা সিঁড়ির মুখের কাছে বসে খেলা করছিল। যখন যার গলা একটু চড়া হয়েছে তখন সে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে।

মা ঠাকুরমাকে ঘরে নিয়ে যাওয়াতে সে-ও পেছন পেছন গেল।

ঘরে বসে বসে আমি শুধু ভাবছি—আমরা মানুষ। দু'চোখ মেলে দেখছি—সংসার। দেখছি—স্নেহ-দয়া-মায়া-মমতা-স্বার্থপরতা নিষ্ঠুরতা সবাই মিলেমিশে এখানে কেমন সহবাস করে।

মেজদা ততক্ষণে চলে গেছেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

ভেতরে বৌদি মাকে বলছেন, "কেন আপনি ওসব কথা বলতে

গেলেন, মা? কী হবে ওসব বলে? নিজেই একসময় কষ্ট পাবেন।"

"কষ্ট কি আমি কম পাচ্ছি, বৌমা! সংসারটা ভেতরে ভেতরে এমনিভাবে ক্ষয়ে যাচ্ছে—এ যে সহ্য করতে পারছি না। অরুণ মিছেই চেষ্টা করছে সব ধরে রাখতে। ও কিছুতেই ধরে রাখবার নয়। তাই মাঝে মাঝে বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। মনে হয়, কিছু বলতে পারলে যেন আমি বেঁচে যাই। বরুণ যে এমন হবে, আমি কোনোদিন ভাবতেও পারিনি, বৌমা!"

আমাদের সংসারের যা হালচাল তা দেখে অতি বুদ্ধিমান লোকেরা চোখবুজেই বলে দেবে—বড়দা চিরদিন শুধু ভুলই করে এসেছেন। এত সরল হলে হয় না। ওটা কিছুটা বোকারই লক্ষণ।

অবস্থা দেখে সময় সময় আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবি, সংসারে সাধারণই হয় বেশি। অসাধারণের সংখ্যা অনেক কম এবং তাদের সব সময়ই একটা বিশেষ মূল্য থাকে। তাই সব দেখে শুনেও বড়দার সরলতাকে বুদ্ধিহীনতার সামিল করতে পারা যায় না। ক'জন মানুষের এমন মাত্রাবোধ আছে? ক'জন মানুষ পারে সংসারের আইন-কানুন এমনভাবে মেনে চলতে? যে-যুগে ভালোমানুষ সেজে থাকলে শুধু ঠকতেই হয়, নিজেকে উজোড় করে দিলেও যেখানে খুব কম লোকের মনেই এর জন্যে দাগ কাটে, এই বস্তুতন্ত্রের যুগে—যেখানে মানুষের চাহিদা

সীমাহীন, কিন্তু দয়া-দাক্ষিণ্য, মায়া-মমতা সীমাবদ্ধ, জাগতিক চাহিদা মানুষকে যেখানে এসব মৌলিক বৃত্তিগুলো থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছে—সেখানে দাঁড়িয়ে বড়দার দিকে তাকালে আজকের দিনের সঙ্গে তাঁর অনেক ব্যতিক্রম চোখে পড়বে বৈকি!

মনে পড়ে, মা একদিন বৌদিকে বলেছিলেন, "বৌমা একজোড়া বালা গড়িয়ে নিও। মাত্র ক'গাছা চুড়ি পড়ে থাকো, হাতটা খুব খালি খালি লাগে।"

বৌদি বড়দাকে বলেছিলেন একথা।

বড়দা বলেছিলেন, "আরো ক'দিন পরে গড়িয়ে নিও। এখন দু'জোড়া বালার টাকা দিতে একটু অসুবিধে হবে।"

"দু'জোড়া কেন?"

"ঘরে যখন তোমরা দু'জন বৌ আছ তখন তোমার একার জন্যে কিছু করা যায় না সুমি। বুঝতে পারছি, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তবু সবদিক বিবেচনা করে এই কষ্টটুকু স্বীকার করে নাও!"

"কিন্তু জয়ন্তীর তো বালা, চূড় দুই-ই রয়েছে।"

"তাহলেও।"

বৌদি মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখ তার সেখানে—কোনো আত্মীয় বাড়িতে অথবা বিয়ে বাড়িতে যাবার সময়ও জয়ন্তী বৌদি কোনোদিন বলেনি—দিদি, আমার বালাজোড়াটা কি চূড়জোড়াটা তুমি পরে যাও।

বড়দা নাকি বলেছিলেন, "দুঃখ পেও না। অলংকার মানুষের বাহ্যিক রূপই শুধু বাড়াতে পারে, অন্তরের রূপ তার প্রভাবে কিছুমাত্র উজ্জ্বল হয় না। ওটা একান্তই নিজের জিনিস, তাই তোমার অন্ততঃ দুঃখ পাওয়া সাজে না।"

জানি, বড়দার বিশ্বাস, তাঁর জীবন বোধ আজকের দিনে অনেক ক্ষেত্রে অচল। কিন্তু তাঁকে ভুল বলি কোন্ সাহসে? তা পারি না বলেই তাঁর দুঃখটা এত বেশী করে মনে বাজে।

ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন মেজদা। অফিসে বেরোচ্ছেন। বৌদি দেখতে পেয়ে সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন।

"না খেয়ে কোথায় যাচ্ছ, বড়ঠাকুরপো?"

"রাস্তা ছাড়ো।"

মেজদার গলা খুব গম্ভীর।

"আগে খাবার ঘরে চলো, তারপর।"

"সময় নেই, আমার তাড়া আছে।"

"না খেয়ে থাকবে?"

"দেখি কী করা যায়।"

"কী করা যায় মানে? ছেলেমানুষী করো না, বড়ঠাকুরপো। খেতে চলো।"

বৌদি ব্রিফকেসটা ধরতে যান কিন্তু বাধা দিয়ে মেজদা বললেন, "আমি এখন খাবো না। রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াও।"

"তুমি না খেয়ে গেলে তোমার বড়দাও কিছুতেই খাবেন না।"

"কেন আর তামাসা করছো, বৌদি!"

কথাটা শুনে সহসা যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন বৌদি। অস্ফুটে বললেন, "কী বললে? তামাসা।"

এরপর আর কিছু বলা যায় না। বলতে সাহসও হয় না। মুখটা নীচু করে সরে দাঁড়ালেন বৌদি। মেজদা একমুহূর্ত কী চিন্তা করে খট্ খট্ বুটের আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেলেন। তারপর

কিছুক্ষণ একটানা মোটরবাইকের ভট্ ভট্ আওয়াজ। রাস্তায় মিলিয়ে গেল আওয়াজটা।

বৌদি মুখ নীচু করে রান্না ঘরে চলে গেলেন। আমি নীরব দর্শক। বলতে ইচ্ছে হলেও আমার কিছু বলা সাজে না। যে-মানুষ নিজেদের বাড়িতেই চোরের মতো দু'মুঠো ভাত গিলে তার কথার কী মূল্য আছে?

মেজদা এমন বেয়াদবি কিছুতেই সহ্য করবেন না।

শুধু একটা চাকরি। যেমন তেমন একটা চাকরি পেলেও এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারতাম।

ঘর থেকে বেরিয়ে রান্না ঘরের দিকে গেলাম।

"মন খারাপ করছো?"

"আমার কপাল।"

বৌদির সংক্ষিপ্ত উত্তর।

আজকালকার বৌয়েরা এমন কথা বড় একটা বলতে চায় না। আস্ত সংসারের উপর ছুরি চালিয়ে দিয়ে শান্তি পেতে চেষ্টা করে। শান্তি তো কিছুটা মনের ব্যাপার। তাই কেউ পায়, কেউ পায় না। বৌদি তো পাবেনই না।

কিছুক্ষণ আগে মা উপরে গেলেন। বড়দার কাছে। মা জানেন, বড়দা মন খারাপ করে বসে আছেন। বড়দা সামান্য আঘাত পেলেও মার বুকে তা বিরাট করে বাজে। সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। এখন তো কোনো কথাই নেই। প্রথম সন্তান বলেই হয়তো এটা হয়েছে। বাবারও তাই ছিল। দুর্ঘটনার পর মা তো বড়দাকে চোখের আড়ালই করতে চান না। স্কুলে যাবার পর, না ফেরা পর্যন্ত মা'র মনটা রাস্তায়ই পড়ে থাকে। সেদিন ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল। ট্রেনের গণ্ডগোলে এমন

হয়েই থাকে। বৌদিরও কত হয়। মা একবার গেটের সামনে যান আবার ঘরে আসেন। কিছুক্ষণ জানালা দিয়ে চেয়ে থেকে আবার গিয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন।

তারপর মা একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, 'তরুণটার একটা কিছু হলে তুই বাবা ও-সমস্ত ছুটোছুটি ছেড়েই দে।"

বড়দা হেসে বলেছিলেন, "তুমি কি আমাকে আরো নিষ্কর্মা বানিয়ে রাখতে চাও নাকি, মা ?"

বড়দা হেসেছিলেন অবশ্য। আমরা হাসিটাই দেখেছিলাম। কিন্তু সেই হাসির মধ্যে কি বিন্দুমাত্রও দুঃখ ছিল না ? কে জানে ? হয়তো পুরোটাই ছিল।

মা চলে এলে বড়দা জয়ন্তীবৌদিকে ডেকে পাঠালেন। আজ রথযাত্রা উপলক্ষ্যে স্কুল ছুটি। নয়তো এতক্ষণে বেরিয়ে যেতেন। বৌদি অফিসে যাবার জন্যে তাড়াহুড়ো করছেন। আজ বেশ দেরি হয়ে গেল।

জয়ন্তীবৌদি সামনে এসে দাঁড়াতে বড়দা তাকে বসতে বললেন। ব্যালকনিতে এসে খবরের কাগজ দেখতে দেখতে আড়-চোখে দেখছিলাম আমি। জয়ন্তীবৌদিকে কেন বড়দা ডেকে পাঠিয়েছেন এটা জানবার প্রবল আগ্রহ থাকাতে খবরের কাগজ পড়ার অছিলায় উপরে চলে এলাম।

বড়দার কথায় জয়ন্তীবৌদি খানিকটা ইতস্ততঃ করলো, বসবে কি বসবে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বসলো না।

বড়দা জিজ্ঞেস করলেন, "বরুণ না খেয়ে গেছে কেন ?"

কথা নেই জয়ন্তী বৌদির মুখে। মনে হচ্ছে যেন খুব জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে বড়দার সামনে। ভেতরে ভেতরে যাদের দুর্বুদ্ধি, উপরটায় তাদের অনেক সময় এমনই দেখায়।

"কী, কথা বলছো না যে ?"

"আমি কী করে বলবো ?"

খুব আলতোভাবে জয়ন্তীবৌদি কথাটা উচ্চারণ করলো।

"তোমারই তো বলবার কথা "

"আমি কিছু জানি না।"

"কেন তুমি জিজ্ঞেস করলে না, না খেয়ে সে অফিসে যাচ্ছে কেন ? নিষেধই-বা করলে না কেন ?"

"নিষেধ করলেও আমার কথা শুনতেন না।"

"শুনতো কি শুনতো না, সেটা পরের কথা। তোমার কর্তব্য তুমি করো নি কেন ?"

জয়ন্তীবৌদি চুপ করে থাকে।

বড়দা বললেন, "এভাবে অশান্তি বাঁধিয়ে কি খুব শান্তি পাচ্ছ ? আচ্ছা বলো তো, কী চাও তোমরা ? এখান থেকে চলে যেতে চাও ? চলে গেলেই সুখী হবে ? বলো সুখী হবে কিনা ?

একটু থেমে আবার বললেন, "বুঝি, তখন ওভাবে বলাতে বরুণ রাগ করেছে. কোনোদিন বলিনি তো। হয়তো আমারও রাগ হতো। হয়তো আমিও না খেয়েই বেরিয়ে যেতে চাইতাম। তাই বলে তোমরা কেউ বাধাও দেবে না ? এটা তোমাদের কেমন বিচার বুঝি না।"

"দিদিতো—"

"দিদির কথা বাদ দাও।" বাধা দিয়ে বললেন বড়দা। "তুমি সামনে এসে দাঁড়ালে ও কিছুতেই না খেয়ে যেতে পারতো না। একটা মানুষ সারাদিন উপোস থেকে ছুটোছুটি করে বেড়াবে এটা তোমাদের কাছে ভালো লাগবে ? যা-ই বলো জয়ন্তী, খুব

অন্যায় কাজ করেছো।"

"উপোস তো আর থাকবেন না। বাইরে কোথাও ঠিক খেয়ে নেবেন।"

"বাইরে খেয়ে নেবে কি না নেবে সেটা আমার প্রশ্ন নয়। আমি জানি, বাইরে সে খেয়ে নেবে। কিন্তু তুমি তো তার স্ত্রী, তার আপনজন, তোমার কি উচিত ছিল না তাকে জোর করে খাইয়ে দেয়া ?"

বলে ম্লান হাসলেন বড়দা। "আমার উপর রাগ করে এমন করেছো, তাই না ? আরে বলো জয়ন্তী, বলো, তুমি বললেও আমি রাগ করবো না। রাগ আমি কারো উপরেই করি না।"

জয়ন্তীবৌদির মুখে কোনো কথা নেই।

"এমন করো না, বুঝলে জয়ন্তী, এমন করো না। নিজেরাই কষ্ট পাবে। একটা সংসারে সবাই মিলেমিশে থাকলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, অন্য কোনোভাবেই তা সম্ভব নয়। ঝগড়া-বিবাদ সব সংসারেই হয়ে থাকে, আবার ওর মধ্যেই সবচেয়ে বেশী আনন্দ পাওয়া যায়। সে-আনন্দ নেবার একটা বিশেষ ক্ষমতা থাকা চাই। যে পারে, সে-ই সংসারে সবচেয়ে বেশী সুখী হয়। এই যে আমার একটা পা, হাঁটু থেকে বাদ দেয়া হয়েছে, তাতে আমার চলবার ক্ষমতাটা তো অনেক কমে গেছে। গেছে তো ? শুধু কি তাই ? দেখতেও যেন কেমন হয়েছে ! ঠিক তেমনি, তোমরা যদি বিবাদ করে চলে যাও, তাহলে এই সংসারেরও অনেকটা অঙ্গহানি হবে। হবে না ? তাতে আমার ক্ষমতা যেমন কমবে, তোমাদের ক্ষমতাও এর চেয়ে বাড়বে না। কমবেই। এটাই নিয়ম।"

জয়ন্তীবৌদি কোনোরকম সাড়াশব্দ করলো না। বড়দা কী বোঝলেন কে জানে ? তবে জয়ন্তীবৌদি যে তাঁর কথাগুলো প্রলাপ

হিসেবেই ধরে নিয়েছে—এ বিষয়ে আমার আর দ্বিমত নেই। কষ্ট হয় বড়দার জন্যে। সংসারটাকে একত্রে ধরে রাখবার কী ব্যর্থ প্রয়াস !

বড়দা আর বেশীকিছু বললেন না। ছাড়া পেয়ে জয়ন্তীবৌদি মনে হলো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

একটু পরে বৌদি অফিসের গোছগাছ করতে উপরে এলেন। বড়দা জিজ্ঞেস করলেন, "খেয়েছো তো ?"

জবাব না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, "খাও নি ?"

"হুঁ।"

"ওটা কী বুঝবো ?"

একটু চুপ থেকে বৌদি বললেন, "বাড়ি থেকে একটা মানুষ রাগ করে না খেয়ে বেরিয়েছে, আমি খাই কী করে ?"

"তাই বলে না খেয়ে অফিসে যাবে ?"

বৌদি জবাব দিলেন না। আলনা থেকে কাপড় নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন। বড়দা ব্যালকনিতে বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন, "তোর বৌদিকে ধরে খাবার ঘরে নিয়ে যা তো।"

বৌদি পাশের ঘরে কাপড় ছাড়তে গেছেন। আদেশ পেয়ে খবরের কাগজটা গুটিয়ে অপেক্ষায় রইলাম। ঘর থেকে বেরোতেই টেনে খাবার ঘরে নিয়ে যাবো। যতসব বাজে সেন্টিমেণ্ট। কী মূল্য আছে এর ? যাদের জন্যে এত, এ-সমস্ত বিষয় বোঝার মতো সূক্ষ্ম অনুভূতি কি তাদের বিন্দুমাত্র আছে ?

বৌদি বেরিয়ে এলে কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে বললাম, "তোমাদের কপালে আরো অনেক দুঃখ রয়েছে।"

হয়তো বড়দা শুনে থাকবেন কথাটা।

"কেন, খাই নি বলে ?"

“মেজদা না বলে গেছেন তামাসা? তোমাদের ওসব তামাসাই। তোমার মুখের দিকে চেয়ে কেউ না খেয়ে থাকবে না —বুঝলে?”

বৌদি কী বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই বললাম, “খেতে চলো।”

“আজ অফিসের অনেক দেরি হয়ে গেল।”

“তাহলে ডুব মেরে দাও। বিকেলে রথের মেলায় যাওয়া যাবে।”

মেয়েরা সবসময়ই চায় নিরাপদ আশ্রয়। গৌরী যখন বুঝলো, আমি আর সেই-আমি নেই, সমাজের গতানুগতিক ভাব-ধারা থেকে অনেকটা সরে গেছি, তখনই ও-ও নিজেকে সরিয়ে নিতে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ও কি স্বার্থপরের মতো কাজ করেছিল? কেন আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারে নি গৌরী? মনে মনেই জবাব বানাতে চেষ্টা করি—মেয়েরা অনেক সময় তা পারে না। কারণ তারা অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত আর সেই অবলম্বন হচ্ছে পুরুষ জাতটা। গৌরী বুঝেছিল, আমার ভিত নড়ে গেছে. তাই ও হৃদয় মন দিয়ে দুঃখকে কিনতে চায় নি। একটা প্রশ্ন জাগে—গৌরী কি এর জন্যে দুঃখ পায় নি? হয়তো পেয়েছে। পাওয়াটাই স্বাভাবিক। সব মেয়েরাই পায়। যে নিজের সম্বন্ধে খুব সচেতন; কোনো হালকা হৃদয়বৃত্তির ধার ধারে না, সে-ই নিজেকে শেষপর্যন্ত সামলে নিতে পারে। সাময়িক দুঃখ

হলেও একসময় মনে থেকে সব মুছে যায়, তখন ভাবতে গেলে এটাকে নিছক ছেলে-খেলা বৈ আর কিছুই ভাবা যায় না।

বিকেলে মৃণাল আর অসীম এলো। ওরা আসে প্রায়ই। বৌদিকে বলেছিলাম, রথের মেলায় যাব। আমারও বলা, বৌদিরও শোনা, ঐ পর্যন্তই। আনন্দ-স্ফূর্তি করে কোথাও যাওয়ার পাট বৌদি অনেকদিন আগেই তুলে দিয়েছেন। মা বললে মাঝে মাঝে সিনেমায় যান, সেও কাছেপিঠে দু'-তিনটে 'হল' রয়েছে বলে। বলাই বাহুল্য, আমার জীবনেও এ-সমস্ত ক্রিয়াগুলোর একেবারে প্রশ্রয় নেই বর্তমানে। কবে দিনের নাগাল পাবো, সেই ভাবনা করতে করতেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছে।

মৃণাল স্থানীয় একটা ওষুধের কারখানায় কাজ করে আর অসীম কাজ করে রিষড়ায় একটা রং-এর কারখানায়। সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে এ দু'জন বাদে আর কেউ কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ-কর্ম আজও পায় নি।

বন্ধুবান্ধব এলে আগের মতো মন খুলে কথা বলতে পারি না। মনে মনে কিছুটা সংকুচিত হয়ে পড়ি। আক্ষেপ মেশানো একটা মানসিকতা এসে যেন গলা চেপে ধরে! তার সঙ্গে কিছুটা লজ্জা আর ব্যর্থতার গ্লানি। আমি আজ সম্পূর্ণ মিথ্যে হয়ে গেলাম! ওরা আমাকে আজও ভালোবাসে বলে আসে। আমার মনে হয়, ওরা আমাকে করুণাই দেখায় বেশী। বেশী না হোক, কিছুতো দেখায়ই। আমার অপমৃত্যু ঘটতে আর বাকি আছে কিছু? ওরা কতবার বলেছে, সন্ধ্যার সময় ক্লাবে গিয়ে বসতে। পারি নি। ওরা তো বলবেই। হয়তো এরকম বলে বলেই পারছি না। যে ক্লাবের পেছনে আমারও অনেক ক্লান্তি রয়েছে, সেখানে তো কিছুই বলার অপেক্ষায় থাকে না। এই বলাটাই আমাকে অনেক

দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ওদের আমি কিছু বুঝিয়ে বলতে পারি না। চুপ করে থাকি। আমি আমার নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছিলাম সত্য, চেষ্টাও করছি তা থেকে বেরিয়ে আসতে, কিন্তু পারছি না। সবাই যেন আমাকে মাটি চাপা দেবারই আয়োজন করছে। অজান্তে ওদের হাতে উঠে আসছে গাইতি-কোদাল। যে নিয়ম অনিয়মের মন্ত্রণায় আবদ্ধ হয়েছিল, এটা সেই নিয়মেরই শাসন। যে স্খলন আমার হয়েছিল তার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ মূল্য আমাকেই গুনতে হবে। এটাই জীবনের চরম সত্য, পরম উপদেশ।

একটা সান্ত্বনা আমার আছে, মৃণালেরা জানে—কেন চাঁতুর দল আমি ছেড়েছি। এই দলছাড়ার কারণটাই ওদের মনে আমার সম্বন্ধে সুস্থ ধারণার জন্ম দিয়েছে।

★ ★ ★

অনেক রাত্রি হয়েছে। চোখে ঘুম নেই। বালিশে মাথা ঠেকিয়ে শুধু আকাশ-পাতাল ভেবে চলেছি। লাস্ট ট্রেনও শাঁখের মতো বাঁশী বাজিয়ে শ্রীরামপুর ষ্টেশন ছেড়েছে অনেক আগে। মাথার কাছে জানালাটা হাত বাড়িয়ে খুলে বাইরের দিকে তাকালাম। বৌদির হুকুমে ওটা বন্ধ করে শুতে হয়। খবরের কাগজে একবার দেখেছিলেন জানালা দিয়ে পাইপ-গানের গুলি ছুঁড়ে কোথায় কোন্ এক যুবককে হত্যা করা হয়েছে। সেই কথা মনে রেখে বৌদির এই ব্যবস্থা।

পাড়া নিঝুম হয়ে গেছে। একটা রিক্সার শব্দ শোনা যাচ্ছে। নওগাঁর দিক থেকে লাস্ট ট্রেনের কোনো যাত্রী পৌঁছে দিয়ে ফিরছে হয়তো। ব্যাটাদের দুরন্ত সাহস। একবার এক যাত্রী নিজেই নওগাঁর কাছে গিয়ে রিক্সাওলার সমস্ত টাকা পয়সা কেড়ে নিয়েছিল। তবু ওরা রাত-বেরাতে কেউ কেউ যে-কোনো জায়গায়

যাত্রী নিয়ে যায়—তিনগুণ চারগুণ ভাড়া হাঁকিয়ে। আবার বেশীর ভাগই মুখের উপর 'না' বলে রিক্সা নিয়ে সরে পড়ে কোলকাতার ট্যাক্সিওলাদের মতো। মুখের উপর ওদের 'না' শব্দটা যেন থাপ্পড়ের মতো কাজ করে। একবার বাবার সঙ্গে কোলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে লাস্ট ট্রেনে ফিরে আর রিক্সা পাওয়া গেল না। অথচ একটা রিক্সা না হলে বাবার বাড়ি ফিরতে খুব অসুবিধা হবে। কিছুক্ষণ পরে গোঁসাইপাড়ার দিক থেকে পোঁ পোঁ বাঁশী বাজাতে বাজাতে একটা আসতেই বাবা জিজ্ঞেস করলেন—যাবে তো ? হাত তুলে না যাওয়ার ভঙ্গী দেখিয়ে অন্য দিকে ঘুরে যায় রিক্সাওলা। তখনই ভেতরে ভেতরে তার এক নিকট আত্মীয়ার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক পাতিয়ে কুটুম্বিতা করে ফেলেছিলাম। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল—ঐ রিক্সাওলাটার মতো ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বুঝি আর দ্বিতীয়টি নেই। কোনোদিন ঘোর বর্ষায় ব্যালকনিতে বসে বসে যখন দেখতাম ভিজে ভিজে কোনো রিক্সাওলা রিক্সা চালিয়ে যাচ্ছে, তখন মনে হতো—তার চেয়ে অবহেলিত মানুষ সংসারে খুব কমই আছে। পলিথিনের পর্দা ঝুলিয়ে জলের ছাট থেকে কাপড় বাঁচাতে ভেতরে বসে সযত্নে তা আবার ধরে রেখেছেন যে যাত্রীটি, তিনি কিন্তু মোটেই ভাবছেন না সেই একটানা ভিজতে থাকা রিক্সাওলাটির কথা। এটাই হয়তো নিয়ম। সংসারে তো অনেকেই অনেকের কথা ভাবে না। ভাবলে চলেও না। কারণ সবাই চলেছে প্রয়োজনের তাগিদে। এই প্রয়োজনই মানুষকে কোনো না কোনো ভাবে তার অজান্তে কিছুটা নিষ্ঠুর করে তোলে। দোষ কারো নেই। তাই যেদিন নওগাঁর মোড়ের কাছে এক রিক্সাওলার টাকা ছিনতাইয়ের কথা শুনেছিলাম, সেদিন মনে কিন্তু সমবেদনাই জেগেছিল ঐ খেটে-খাওয়া মানুষটার জন্যে।

জানালাটা আবার বন্ধ করে দিলাম। রিক্সার শব্দ পেয়ে রাস্তার মোড়ে শুয়ে-থাকা একটা নেড়ী কুকুর ঘেঁাৎ ঘেঁাৎ করে ওঠে। খালি রিক্সার শব্দ হয় বেশী। ছাল-বাক্‌লা ওঠা রাস্তা দিয়ে চলবার সময় সিটের গদিটা এমন ভাবে থপ্‌ থপ্‌ করতে থাকে যে মনে হয় রিক্সাটার দফা শেষ হতে বুঝি আর বেশী দেরি নেই। ঠিক ঐ ধরণের বিশ্রী শব্দ করতে করতে রিক্সাটা অনেক দূরে চলে গেল। চলে গেল না যেন পাড়াটা জাগিয়ে দিয়ে গেল।

উপরের ব্যালকনির আলোটা জ্বললে বাগানের অনেকটা ফর্সা হয়ে যায়। জানি, বড়দা এখনো ঘুমোতে যান নি। আলো জ্বালিয়ে ব্যালকনিতে মেজদার জন্যে বসে আছেন। সেই সকালে যে মেজদা বেরিয়েছেন, এখনো ফেরেন নি। না ফেরা পর্যন্ত বড়দা এমনি ভাবে বসে থাকবেন। বৌদি ঘরের ভেতরে বসে হয়তো কোনো জামাকাপড় সেলাই-ফোঁড়াই করছেন। মেজদার আসার অপেক্ষায় না খেয়ে বসেছিলেন অনেকক্ষণ। মা একসময় এসে বলেছেন, "তোমরা বসে না থেকে খেয়ে নাও। ওরতো এমনই হয়। কখন আসে তার ঠিক আছে কিছু?"

বৌদি রাজি হননি। পুরুষ মানুষ বাইরে থাকলে খেয়ে উঠতে কেমন লাগে! অবশ্য এর আগেও যে নিয়ম ভঙ্গ না হয়েছে তা নয়।

মার কথা ঠেলতে পারেন নি বৌদি। তাছাড়া এ সমস্ত সাবেকী নিয়ম মেজদারও পছন্দ নয়। জয়ন্তী বৌদিরও তাই। খেতে ডাক দেবার পর তার আসতে খুব দেরি হয়নি।

মেজদার মোটর-বাইকের শব্দ শুনলে বড়দা লাইট নিবিয়ে ঘরে যাবেন। মেজদাকে বুঝতেও দেবেন না যে এতক্ষণ তাঁরই জন্যে বসেছিলেন। এ-ভাবে অপেক্ষা করে বসে থাকলে মেজদা রাগ

করেন। অথচ বড়দা নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায়ও যেতে পারেন না। তাই এভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর অগোচরেই বসে থাকেন।

বৌদিকে একটু মন্দও বলেছেন সকালের ব্যাপারটা নিয়ে। "কেন যে তোমরা সামান্য বিষয় নিয়ে অশান্তি বাঁধাও বুঝি না!"

বৌদি বড়দার কথার কোনো প্রতিবাদ করেন নি। বড়দা বলেছেন, "যদি ভালো করে বলতে তাহলে কিছুতেই সে না খেয়ে যেতে পারতো না। তোমরা সবাই দায় সারা ভাবে কাজ করতে চাও। আমাকে পাগল না করে কিছুতেই ছাড়বে না তোমরা! বাড়ি থেকে রাগারাগি করে বেরিয়েছে—সেই রাগ নিয়ে কোথায় গিয়ে বসে আছে কে বলবে! কাণ্ডজ্ঞান বলে কোনো বস্তু একেবারেই নেই!"

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থেকে আবার বলেছেন, "আমি একশবার বারণ করেছিলাম—দু'চাকার শয়তান কেনার দরকার নেই। লরী বাসের পথ। তা আমার কথা কে শোনে!"

বৌদি চুপ করে বসেছিলেন। মানুষটার উপর শত চেষ্টা করেও রাগ করা যায় না। রাগের চেয়ে মায়াই হয় বেশী।

কিছুক্ষণ পরে গেটের সামনে মোটর-বাইকের শব্দ শোনা গেল। জানালাটা আবার একটু ফাঁক করে দেখলাম—সামনের বাগানটা আর ফর্সা নেই।

শুয়ে শুয়ে সিঁড়ির ধাপে ধাপে বৌদির পায়ের শব্দ শুনছি। চাবি হাতে বারান্দার কোলাপ্‌সিবল গেট খুলে দিতে যাচ্ছেন। খানিকক্ষণ পরে খাবার ঘরে লাইটের সুইস্ টেপার শব্দ, ডাইনিং টেবিলের উপর জলের জার অথবা কাঁচের গেলাস রাখবার মৃদু ঘর্ষণ। মোটর বাইক ততক্ষণে গ্যারেজ করা হয়ে গেছে। বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ির মুখে এসে থামে একজোড়া বুটের শব্দ, তারপর খাবার ঘরের

দিকে এগিয়ে যায়।

"আমার খাবার দিও না, খেয়ে এসেছি।"

বুটের শব্দ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়।

খাবার ঘরে সুইসের আর একটা শব্দ হয়। অন্ধকার হয়ে গেছে হয়তো ঘরটা। দরজার শিকলটা মৃদুভাবে ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে। তারপর বাইরের বারান্দার কোলাপ্‌সিবল গেটের একটা অংশ খ্যাঁচ্‌ করে এসে আর একটার সঙ্গে মিশে যায়।

মেজদা গেটটাও বন্ধ করে আসেন নি? রেখে দিয়েছেন বৌদির জন্যে?

মেজদার ফিরতে যে এত রাত হলো, জয়ন্তী বৌদির কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি এরজন্যে। কারণ সবই তো তার জানা। নিঃশব্দে ঘরের দরজা বোধ হয় খুলে দিয়েছিল নীচে মোটর-বাইকের শব্দ শুনে।

বৌদি ধীর পায়ে উপরে উঠে যাচ্ছেন। ঘরে গেলে বড়দা জিজ্ঞেস করবেন, "চলে এলে যে? বরুণকে খেতে দেবে না?

বৌদি বলবেন, "খাবে না।"

কিছুটা অবসন্ন শোনাবে তাঁর গলাটা।

শুনে বড়দা হয়তো বাঁ হাতের আঙ্গল দিয়ে কপালটা কিছুক্ষণ ঘষে, শেষে মাথার চুলে আঙ্গুলগুলো ডুবিয়ে দিয়ে কোনো কথা না বলে চোখ বুজে পড়ে থাকবেন।

ওদিকে নির্বিকার মনে মেজদা জয়ন্তী বৌদির কাছে তাঁর আজকের দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ করতে করতে অফিসের জামা-প্যাণ্ট ছাড়বেন, নিজেই সেগুলো যথাস্থানে রাখবেন। জয়ন্তী বৌদি আধ-শোয়া অবস্থায় শুধু শুনবে আর দেখবে। তারপর ঠোঁট বাঁকিয়ে বলবে বড়দার কথাগুলো—সকালে ডেকে নিয়ে যেসব বলেছিলেন।

এরই মাঝে মেজদা একসময় গিয়ে বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে আসবেন। ঘরে তখন ফিকে সবুজ আলো জ্বলে গেছে। সেই সবুজ বাতির মায়ায় নরম বিছানার আমেজে অনেক পরিকল্পনার জন্ম হবে। আর সেখান থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে সংসার যুদ্ধে পরাজিত এক অদক্ষ মহানায়ক নিদ্রাহীন চোখে স্বপ্ন ভাঙ্গার হতাশা নিয়ে মর্ম বেদনায় জ্বলে মরবেন।

অনেক চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারছি না। কান দিয়ে যেন গরম ভাপ বের হচ্ছে। কপালের দু'পাশের শিরা দু'টি দপ্‌দপ্‌ করছে অসম্ভব রকম। মাথার কাছে জানালাটা খুলে দিলে হয়তো ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুম আসতে পারে। কিন্তু বৌদির ব্যবস্থা ভাঙ্গতে মন সায় দেয় না। টেবিল ফ্যানটা ইচ্ছা করলে চালিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তার ভোঁ-ভোঁ ডাকটা একেবারে অসহ্য। তাই ওটাকে বেশী রাত্রিতে আর চালাই না।

নিঃশব্দে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। একটা করি-ডোর দিয়ে যেতে হয় বাড়ির সামনের বারান্দায়। ওখানে একটা বেতের চেয়ার রয়েছে। গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলে হয়তো শরীরটা ঠাণ্ডা হতে পারে। তাই করলাম। কেউ যেন টের না পায় তার জন্যে পা টিপে টিপে গেলাম। কাছেই মা'র শোবার ঘর। মা'র আবার ঘুম খুব পাতলা। টের পাবার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ একটু আগে মেজদা ফিরেছেন। মেজদা না আসা পর্যন্ত মা-ও ঘুমোন নি। বালিশে মাথা রেখে শুধু পড়ে রয়েছেন। কানটা রয়েছে রাস্তার দিকে। মেজদা যে খেতে এলেন না, তাও লক্ষ্য রেখে-ছেন। এভাবে দিনের পর দিন মা-ও বড়দার মতো ভেতরটা ক্ষয় করে দিচ্ছেন। আর বৌদি ? ভাবতে গিয়ে কপালের শিরা দু'টি আরও দপ্‌দপ্‌ করে ওঠে।

এখানে দাঁড়িয়ে পূর্বদিকে তাকালে আগে জলের ট্যাঙ্কটা দেখা যেতো। এখন সামনে কয়েকটা বাড়ি হওয়াতে আড়ালে পড়ে গেছে। এই জলের ট্যাঙ্কটা যেন জীবনের একটা বিশেষ মুহূর্তের নীরব সাক্ষী। এর নীচ দিয়ে যাবার সময় মনে হতো, এ যেন এক অন্য জগতের পথ। সবকিছু থেকে একেবারে আলাদা। রঙিন। স্বপ্নময়। এ এক বিচিত্র মানসিকতা, যা মুখে ঠিক প্রকাশ করা যায় না। শুধু অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হয়।

"ছোট ঠাকুর পো!"

বৌদির ডাকে চোখ মেলে তাকাই। পূবের আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে। চেয়ারে বসেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।

"তুমি এখানে কখন এসেছো? এভাবে ঘুমিয়েছিলে চেয়ারে বসে বসে?"

"ঘুম পাচ্ছিল না, তাই এখানে এসে বসেছিলাম।"

কিঞ্চিৎ লজ্জা মেশানো স্বরে বললাম।

"যাও, ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো, চোখ দু'টো তো লাল লাল দেখাচ্ছে। ঘুম হচ্ছিল না কেন? শরীর খারাপ হয়েছে? দেখি? শরীর তো ভালোই। তবে ঘুম না হবার কারণ কী? কিছু ভাবছিলে নাকি রাত জেগে জেগে?"

"আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। সাত-সকালে উঠে উকিলের মতো এমন জেরা করতে শুরু করেছো—যেন মনে হচ্ছে চুরি করতে বেরিয়েছিলাম।"

বৌদি হাসলেন। আমিও।

"কাজটা কিন্তু মোটেই ভালো করোনি, ছোটঠাকুর পো। এভাবে বাইরের বারান্দায় রাত কাটিয়েছো, তোমার বড়দা শুনলে ভীষণ রাগ করবেন। আমিতো করেছিই।"

"তুমিও করেছো ? মনে হচ্ছে না তো ?" মৃদু হেসে বললাম।

"হাসির কথা নয় কিন্তু। তোমার মাথার কাছের জানালা যার জন্যে বন্ধ রাখা হয়।" একটু শাসনের সুরও বোঝা গেল বৌদির গলায়। "এসো, ঘরে গিয়ে ঘুমোও।"

"না, আর ঘুমোব না। সকাল হয়ে গেছে।"

বৌদির পেছনে পেছনে ভেতরের দিকে গেলাম—।
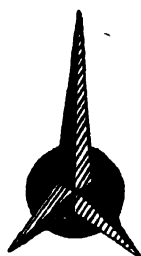
সকালটা বৌদির খুব ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটে। রান্নাঘর থেকে বেরোবার বড় একটা ফুরসত পান না। কোনোদিন কথাবার্তায় যদি রান্নার দেরি হয়ে যায়, তাহলে নির্ধারিত ট্রেন ধরতে খুবই অসুবিধা হয়। বড়দার লাইনে ট্রেনের সংখ্যা কম বলে তাঁকেই দুর্ভোগ পোয়াতে হয় সবচেয়ে বেশী। বরাবর যেটায় যান সেটা ধরতে না পারলে, পরেরটার জন্যে কম করেও এক ঘণ্টা বসে থাকতে হয়। ছুটাছুটি করে যাতে ট্রেন ধরতে না হয় তার জন্যে মা ঘরের কাজ সময় মত সেরে আধ ঘণ্টা আগে ষ্টেশনে গিয়ে বসে থাকবার নির্দেশ দেন। একটি দুর্ঘটনা যার সংসারের ছবিটা এমন নির্মমভাবে এঁকে দিতে পারে তাঁর পক্ষে ও-রকম নির্দেশ দেওয়াই স্বাভাবিক। বৌদি তা যথাসাধ্য মানতে চেষ্টা করেন।

পায়ে পায়ে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। হীরুর মা দরজার একপাশে বসে মসলা করছে। বৌদির সঙ্গে দু'একটা কথা

বলবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এখন হয়তো হয়ে উঠবে না। বড়দা ছোট একটা ব্যাগে করে বাজার থেকে কিছু মাছ নিয়ে ফিরেছেন। বাজারটা আগের দিন সন্ধ্যায় করে রাখা হয়। বড়দাই করেন। অবশ্য ব্যাগ হাতে নিয়ে হীরুর মা সঙ্গে যায়। কাল ভালো মাছ পাওয়া যায়নি বলে আজ আবার যেতে হয়েছিল। বৌদি বারণ করেছিলেন। একদিন নিরামিষই খাওয়া যাবে।

কিন্তু বড়দা বলেছিলেন, "জানোতো নিরামিষ হলে বরুণ খেতে পারে না। এটা তার ছোটবেলার অভ্যেস। কাল না খেয়ে বেরিয়ে ছিল, আজ আবার নিরামিষ খেয়ে যাবে? কতক্ষণ আর লাগবে, নিয়েই আসি কিছু মাছ।"

একবার যখন মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, নিষেধ করেও কোনো ফল হবে না। বৌদি মাছের ব্যাগটা বের করে দিয়েছিলেন।

বড়দা যথা সম্ভব সক্রিয় থাকতে চেষ্টা করেন। স্নানের আগে বৌদি জল পাম্প করে দিয়ে এলে চলবে না। রাগারাগি করবেন। নিজের হাতে জল পাম্প করে নেবেন। কলতলায় বসে ছুটির দিনে নিজেই নিজের জামা-কাপড় কাচবেন। শুধু মেলে দেন বৌদি এসে। ওটা সম্ভব হয়ে ওঠে না সব সময়। সকাল বিকালের জল খাবারও নীচে এসে খাবেন। বৌদি প্রথম প্রথম উপরে নিয়ে যেতেন। কিন্তু এখন উঠা নামাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন বলে নীচেই নেমে আসেন। মা কিছু বলতে এলে জবাব দেন, "তোমরা কি আমাকে একেবারে অথর্ব বানিয়ে রাখতে চাও নাকি? এ-কাজটুকুও যদি না করতে পারি তাহলে তো দেখছি অচল হয়েই পড়তে হবে একদিন।"

বাজারে যাওয়া নিয়েও মা'র আপত্তি। বরুণ যেতে পারে না? কিন্তু মেজদা কোনো দিনই এসবের ধার ধারেন নি। সংসারে

কখন কী প্রয়োজন, হাট-বাজার হলো কী হলো না, কোথায় কখন কী লৌকিকতা করতে হবে এসব তাঁর চিন্তার মধ্যে পড়ে না।

গণ্ডগোলে জড়ানোর আগে আমিই এসব বিভাগের কর্মী ছিলাম। এখন বড়দা আমাকে খুব একটা বাইরে পাঠাতে চান না। বৌদিও না। যদি কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে যাই ?

বড়দা উপরে চলে গেলেন। এখন ব্যালকনিতে বসে খবরের কাগজ পড়বেন। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, খবরের কাগজটা নীচে পড়তে এনেছিলাম। বড়দাকে দিয়ে আসা দরকার।

সিঁড়ির মুখেই মেজদা সামনে পড়লেন। ব্রিফকেস হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। জুতোর শব্দ পেয়ে বৌদি রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন, মেজদা ততক্ষণে বাইরের বারান্দায় চলে গেছেন। বৌদি কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে আবার নিজের কাজে গেলেন। মুখ দেখেই মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছিলাম।

খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে উপরে উঠলাম। বড়দা ব্যালকনিতে নেই। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম বিছানার উপর বসে আছেন। ডানাকাটা জটায়ু!

নিঃশব্দে কাগজটা টি-পয়ের উপর রেখে নীচে চলে এলাম। রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে ডাকলাম, "বৌদি"—

বৌদি তখনই তাকালেন না। মনে হলো চোখের জল লুকিয়েছেন। উনুনের ধারে একটা কলাই করা থালায় মাঝারী ধরণের একটা ইলিশ মাছ। যেন অবহেলিত ভাবে পড়ে রয়েছে।

বৌদি তাকালেন।

"বলবে কিছু ?"

রাজা কোন্ ফাঁকে রান্নাঘরে গিয়ে মাছটার সামনে নীচু হয়ে বসে বলতে শুরু করেছে—"জুজু মাছ। জুজু মাছ।" আঙুল

দিয়ে মাছটার চোখে বারকয়েক টিপও দিয়েছে। বৌদি 'এই ধরিস্ না' বলে রাজার হাতটা ধুইয়ে দিয়ে দরজার সামনে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু বলবে নাকি, ছোটঠাকুরপো ?"

সরাসরি বললাম, "তোমরা বড় ভুল করছো। যা হবার নয় তার পেছনে ছুটে কেন নিজেরা এভাবে দুঃখ পাচ্ছ ?"

সিঁড়িতে বড়দার ক্রাচের শব্দ শোনা গেল। নীচে নামছেন। নামতে নামতে একবার তাকালেন। তারপর বারান্দার দিকে চলে গেলেন।

সাধ করে বড়দা মাছ এনেছেন। বৌদির নিষেধ সত্ত্বেও। সেই মাছ না খেয়েই কাউকে কিছু না বলে মেজদা বেরিয়ে গেছেন, ব্যাপারটা যে বড়দার মনে কতখানি আঘাত দিয়েছে তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

বারান্দায় গিয়ে দেখলাম, বড়দা গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামলেন। বিষণ্ণ মনে মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। হয়তো দীনেশকাকার বাড়িতে যাচ্ছেন। মনে হয় আজ ইস্কুলে যাবেন না। গেলে এসময়ে বেরোতেন না। খুব অসুবিধা না থাকলে ইস্কুল কামাই করতে দেখা যায় না বড়দাকে।

বৌদিও বারান্দায় এলেন। বড়দা তখন অনেকটা এগিয়ে গেছেন।

অন্যদিন যেরকম তাড়াহুড়ো করে রান্নাবান্না সারা হয়, আজ আর তা হলো না। বোঝা গেল বৌদিরও অফিসে যাবার তাড়া নেই।

বেলা এগারোটা নাগাদ বড়দা ফিরলেন। বৌদিকে বাড়িতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি অফিসে যাও নি ?"

"না।"

কারণ জিজ্ঞেস না করে বড়দা উপরে উঠে গেলেন। ইচ্ছে করলেই এখানে অনেক কিছু কথা হতে পারতো। কিন্তু কেউই আর কথা বাড়াতে চাইলেন না। হবে তো সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি।

সহসা আমার মাথায় উদ্ভূত একটা চিন্তা এসে ভর করে। আজ আমি বড়দার জন্যে কাতর। একদিন আমিও তো মেজদার মতো এমন হয়ে যেতে পারি। সেদিন হয়তো বড়দার জন্যে মনের এককোণে একটু মায়া-মমতাও থাকবে না। আমার নিজের অন্যায়টা তখন হয়তো নিজের নজর এড়িয়ে যাবে। হয়তো-বা সব বুঝেও কোনোকিছুতে গা করবো না। মনে হবে, যা করছি তা-ই ঠিক। অত্যন্ত স্বাভাবিক। আজ আমার কাছে রাজার চেয়ে স্নেহের পাত্র এ-বাড়িতে আর কেউ নেই। নিজের সংসার আর সন্তান যতদিন না হয়, ততদিন এমনই একটা স্নেহের টান থাকে বাড়ির ছোটদের উপরে। নিজের সন্তানের মুখ দেখলে সেই স্নেহের টান নিজের অজান্তেই একসময় অনেক শিথিল হয়ে আসে। এটা ইচ্ছাকৃত হয় না। কারো হাতও নেই এর মধ্যে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপারটা হয়ে যায়। একেবারে আপন বলতে যা বোঝায় তা বাদ দিয়ে সবই হয়ে পড়ে গৌণ। দয়া-মায়া-স্নেহ-ভালোবাসা অনেকটা মাপের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

নিজের বিবেককে প্রশ্ন করি, একদিন কি এমন হয়ে যাব? এমন অকৃতজ্ঞ? এই অকৃতজ্ঞতার মধ্যে কতটা সুখ? কতটা শান্তি পাওয়া যায় পরিজনদের সব দায়িত্ব এড়িয়ে শুধু আপনটুকু চিন্তা করে? কোনো উত্তর মেলে না। মেলে নি কোনোদিন। এ জিজ্ঞাসা অনেককালের। এ সমস্যা কোনোদিন সমাধান হবার নয়।

বড়দা মিছেই কষ্ট পাচ্ছেন।

অভিমান করে দুপুরে তিনি খেতে আসতেও চাইলেন না। বৌদি সাধাসাধি করে নিষ্ফল হয়ে ফিরে এলেন। তারপর মা গেলেন। শেষপর্যন্ত মা'র কথা অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। যতক্ষণ বড়দা খেলেন, মা পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। অবাধ্য ছেলেকে শাসন করে যেমন ভাবে খাওয়ানো হয়, ঠিক তেমনি ভাবে।

খেতে খেতে বড়দা বললেন, "হয়তো আমি ভুলই করছি, মা। তুমি কী বলো?"

"সংসারে এমন ভুল যদি সবাই করতো তাহলে তার চেহারাটা অন্যরকম হয়ে যেতো।" মা একটু থেমে আবার বললেন, "তবে একথা বলতে পারি—একালে তোর মতো ছেলেরা একেবারে অচল।"

"নিজের উপর আমার একটা বিশ্বাস ছিল, মা। বিশ্বাসটা অতিমাত্রায়ই ছিল। মনে করতাম, আমার কথাই হয়তো শেষ কথা। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, একটা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আমি চলেছি এতদিন। আমার কথার পরেও যে আরো কথা থাকতে পারে সেটা আমার চিন্তার বাইরে ছিল।"

"যা ভেঙ্গে যেতে বসেছে, শত চেষ্টা করেও তা আর জোড়া দিতে পারবি না, অরুণ।"

মা যেন একেবারে নির্বিকারভাবে কথা ক'টি বলে গেলেন। বাইরে থেকে দেখে বোঝবার কোনো উপায় নেই, কিন্তু ভেতরটা কুরে কুরে ক্ষয়ে যাচ্ছে মা'র।

"এ-বাড়ি ছেড়ে গিয়ে বরুণ কি সত্যি সুখী হবে, মা?"

"সে নিজে সুখী হবে কিনা জানি না, তবে এই চক্রান্তের পেছনে যারা আছে তাদের তো লাভ হবে!"

বহুদিন বাদে সন্ধ্যার পর ক্লাবে গেলাম। বসে বসে আলমারির বইগুলো দেখছিলাম। বই রাখবার জন্যে আরও একটা নতুন আলমারি কেনা হয়েছে। বইএর সংখ্যাও বেড়েছে অনেক। খেলাধূলোর সঙ্গে পাঠাগার করবার প্রস্তাবটা আমিই দিয়েছিলাম। ক্লাব চালাতে গেলে এটার দরকার। প্রথমে এর-ওর বাড়ি থেকে চেয়ে-চিন্তে খান-পঞ্চাশেক বই নিয়ে শুরু হয়েছিল। তারপর গোটাকয়েক সিনেমা-শো করে সেই লাভের টাকায় এ-পর্যন্ত হয়েছে। পাড়ার লোকের যথেষ্ট উৎসাহ আছে যাতে প্রতিষ্ঠানটি আরও বড় হয়। দু'চার জনের ব্যক্তিগত দানের ফলে গতবছর নাকি ঘরটারও সংস্কার করা সম্ভব হয়েছে।

সন্ধ্যার সময়ই পাঠাগার খোলা হয়। সভ্যরা নেয়া বই জমা দিয়ে নতুন বই নিয়ে যায়। মৃণাল বই দেয়া-নেয়ার ব্যাপারটা সামলায়।

একদিন এই পাঠাগারের জন্যে কত উৎসাহ আর উদ্দীপনা ছিল। মনে ছিল কত সামাজিক উন্নতি সাধনের সংকল্প। সব কিছুতেই অনুভব করতাম গৌরীর প্রচণ্ড অনুপ্রেরণা। সেই অনুপ্রেরণাও একদিন মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল। মূল্যহীন মনে হয়েছিল পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা। দেশের কাঠামোটাকে দলে-মুচ্ড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল। কী হবে শিক্ষা দিয়ে? কী মূল্য আছে এই শিক্ষার? একটা অসাড় গতানুগতিক ধারাকে বাঁচিয়ে রেখে কী লাভ? সব ধ্বংস করে ফেলো।

হয়তো কোনোদিনই তা সম্ভব হবে না। এটা আমার নিজের বিশ্বাস। অপরে কী মনে করে জানি না, জানতে চাইও না। একটা সত্য বুঝতে পেরেছি, পৃথিবীতে যে যার কাজটুকু ভালোভাবে করলেই অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু কেউ তা করছে না। মানুষের নৈতিক পরিবর্তন যতদিন স্বেচ্ছায় না আসে ততদিন কিছুই করবার নেই। দুঃখ-দারিদ্র্যও কোনোদিন দূর হবে না।

মৃণালের ডাকে ভাবনার জাল কেটে যায়—"কী রে, মনে হচ্ছে খুব গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিস?"

"না না, কী আর চিন্তা করবো!"

সহজভাবেই বলতে চেষ্টা করলাম।

"নাটকের মধ্যে আছিস্ তো?"

"বলতে পারছি না।"

অসীম একটু দূরে বসে একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। সেটা থেকে চোখ তুলে জানতে চাইলো—"বলতে পারছি না মানে?"

"মানে আবার কী? আমার দ্বারা ওসব হবে না।"

"নতুন নাকি? করিস নি কোনোদিন?"

"কোনোদিনের কথা বাদ দে।"

"ঠিক আছে, তোকে করতে হবে না।" মৃণাল বললো।

"রাগ করলি?"

"না। তোর কোনো অসুবিধে ঘটিয়ে আমরা কিছু করতে চাই না।"

মৃণালের কথার কোনো প্রত্যুত্তর করলাম না। মৃণালই খানিকক্ষণ চুপ থেকে আবার বললো, "এখনো তুই সহজ হতে পারলি না। তুই কি মনে করিস আমাদের কারো সংসারেই কোনো সমস্যা নেই? আমরা কেউ কেউ ছোটখাটো কিছু কাজ-কর্ম করছি এটা ঠিক, কিন্তু এতেই কি আমাদের জীবনের সব সমস্যা মিটে গেল? মনে করে নিয়েছিস আমরা সবাই সুখে শান্তিতে আছি? আর যত অশান্তি কেবল তোর?"

আমি প্রতিবাদ করলাম না। করতে পারলাম না। মৃণালই বলতে লাগলো—"আসলে ব্যাপারটা কী জানিস? যে দিনকাল পড়েছে, তাতে, মনটা আমাদের কারোরই সুস্থ থাকবার কথা নয়। কিন্তু এর মধ্যেই বাঁচতে হবে, সুখ করতে হবে, আনন্দ পেতে হবে। তুই এ্যাড্জাষ্ট্ করতে পারছিস না তাই কষ্ট পাচ্ছিস।"

বলে মৃণাল উঠে দাঁড়ালো। টেবিলের উপরে জমা-দেয়া বইগুলো আলমারিতে রাখতে রাখতে বললো,—"যা বললাম, একটু ভেবে দেখিস। মনে হয় খুব একটা আনজাষ্ট্ কিছু বলি নি।"

ক্লাব থেকে ফিরে দোতলায় সিঁড়ির মুখে উঠতেই শোনলাম বৌদি বড়দাকে বলছেন,—"যা হতে চলেছে হতে দাও। একা শুধু তুমি ভাবলে কী হবে, আর তো কেউ ভাবছে না।"

"কিন্তু ইনি যে আমায় সবসময়ই শাসন করছেন, সুমি।"

আঙ্গুল দিয়ে বাবার ফটোটা দেখিয়ে দিলেন বড়দা।

"তবুও তুমি কারো বাধা হতে যেও না। যে যা করে সুখ পায় করুক।"

"একে তুমি সুখ বলছো ?"

"তোমার সুখের মান দিয়ে অন্য কারোর সুখের বিচার হবে— একথা কেন ভাবছো ?"

"ঠিকই বলেছো !"

অস্ফুটে বললেন বড়দা। "মা'র জন্যে কষ্ট হয়। মুখে বড় একটা বলেন না কিছু। কিন্তু ভেতরটা শেষ হয়ে যাচ্ছে।"

"সব মা-ই চান, সংসারে তাঁর ছেলেরা মিলেমিশে থাকুক। কিন্তু ক'টি ক্ষেত্রে তাঁদের সে-সাধ মেটে ? তাই ভেতরটা শেষই হোক আর যা-ই হোক, মাকে সবই সহ্য করতে হয়। সহ্য করার অসীম ক্ষমতা দিয়েই ভগবান তাঁদের সংসারে পাঠান।"

সিঁড়িতে কা'র পায়ের শব্দ হলো : দু'জনেই সেদিকে তাকান। দীনেশকাকা আসছেন। কিছুটা দূরে সরে গিয়ে ব্যালকনির রেলিং ধরে দাঁড়ালাম। বৌদি উঠে জায়গা করে দিলেন। আমার দিকে একবার তাকালেন।

"আসুন কাকা, বসুন।"

"তুমি আবার উঠলে কেন, বৌমা ? বসো না।"

বলতে বলতে দীনেশকাকা আর একটা চেয়ারে বসলেন।

"কেমন আছেন, কাকা ? শরীরটা নাকি একটু খারাপ হয়েছিল ?"

বৌদি জিজ্ঞেস করলেন।

"এই একটু সর্দ্দি জরের মতো হয়েছিল। আর বৌমা

শরীরেরই বা দোষ কী! বয়েস তো অনেক হলো। দিন দিন তো যন্ত্রটা পুরোনোই হচ্ছে। যে-ক'দিন থাক। এই জোড়া-তালি দিয়েই চলতে হবে আর কি! এক একবার কিন্তু তোমার শ্বশুরের উপর ভীষণ রাগ হয়। আমাকে ফাঁকি দিয়ে স্বার্থপরের মতো দিব্যি রাজসুখ করছেন।"

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে বাবার ফটোটা দেখা যাচ্ছে। দীনেশকাকার কথায় বাধা দিয়ে আমার যেন বলতে ইচ্ছে হচ্ছে—না কাকা, বাবা রাজসুখে নেই। স্বর্গে থেকেও তিনি বড় কষ্ট পাচ্ছেন। আমি মেজদা তাঁর অপদার্থ পুত্র, তাঁর আদর্শের মর্য্যাদা আমরা দিতে পারি নি, আমরাই তাঁকে রাজসুখে থাকতে দিলাম না!

দীনেশকাকা আমাদের সব কথাই জানেন। বড়দাকে সান্ত্বনা দেন, মাকে দুঃখ করতে বারণ করেন।

"আপনারা কথা বলুন, কাকা, আমি একটু আসছি।"

বৌদি নীচে যাবার জন্যে পা বাড়ান।

"শোন বৌমা।" দীনেশকাকা ডাকলেন। "যাচ্ছ তো চা আনতে। কিন্তু ঐ চা পর্যন্তই। 'টা' যেন আর এনো না।"

"আচ্ছা তাই হবে।"

হেসে চলে গেলেন বৌদি। যাবার সময় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "একটু খাবে নাকি?"

"না।"

বড়দা তখন দীনেশকাকার কাছে বলছেন, "তরুণটাকে নিয়েই বড় বিপদে পড়েছি, কাকা। একটা কাজকর্ম হয়ে গেলে আমি বেঁচে যেতাম। বিনা কাজে বসে থাকলেই মন শুধু বাইরের দিকে যেতে চায়। মাথায় দুর্বুদ্ধি জাগে। যাদের আজ খারাপ বলছি,

অধিকাংশেরই কিন্তু তাই হয়েছে।"

"এ একটা বিরাট সমস্যা অরুণ। কিছুই করবার নেই। এ সমস্যা দিনকে দিন বেড়েই যাবে।"

"কিন্তু এভাবে তো কোনো দেশ চলতে পারে না।"

"চলছে আর কোথায়? যেভাবে চলছে ওকে কি চলা বলে? বেকার বাড়ছে, জিনিসের দরও হু হু করে বেড়েই চলেছে, ওদিকে ব্যবসায়ীর সিন্দুকে কালো টাকার পাহাড় জমছে। তবে কিছুটা আশার কথা এই—ঐ কালোটাকাগুলোর উপরে সরকারের ইদানীং নজর পড়েছে। কাগজ খুললেই তো দেখতে পাচ্ছ কী হারে সব বেরুচ্ছে ব্যাঙ্কের এক একটা লকার থেকে; মায় পায়খানা বাথরুমে পর্যন্ত কালোটাকার ছড়াছড়ি। যে দেশে হিসেবের বাইরে কোটি কোটি টাকা পচতে থাকে সে দেশের অর্থনীতি তো মার খাবেই। শত শত সমস্যা এগিয়ে আসবেই। সরকারই আর কী করে সামলাবে?"

বৌদি তু'কাপ চা নিয়ে এলেন। দীনেশকাকা হাত বাড়িয়ে একটা নিলেন। বড়দা তাঁর কাপটা নিতে নিতে বললেন, "আমার এখন না হলেও হতো।"

"ঐ একটা নেশা।" দীনেশকাকা চায়ে চুমুক দিয়ে বৌদির দিকে তাকালেন। "তোমার কাকীমার কাছে যে কত কথা শুনতে হয় এর জন্যে!"

মৃদু হাসেন বৌদি। "সামান্য আদার রস দিয়ে এনেছি, কাকা। একটু সর্দি সর্দি ভাব আছে আপনার, ভালো লাগবে।"

"সে আমি চুমুক দিয়েই টের পেয়েছি। এই জন্যেই তো বলি, বৌমা আমার অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে কাজ করতে সিদ্ধহস্ত।"

"আপনারা কথা বলুন, কাকা। আমার আবার নীচে যেতে হবে।"

"আচ্ছা বৌমা, তুমি এসো।"

রান্নাঘরে হয় তো অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। বৌদি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

বড়দা দীনেশকাকার সঙ্গে কথা বলবেন। আমিও আর দাঁড়িয়ে থাকলাম না। নীচে নেমে গেলাম।
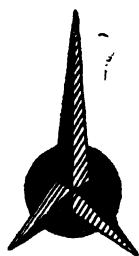
রাত্রিতে একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। এ-বাড়ির সবার কল্পনার বাইরে ছিল ঘটনাটা। রাত্রি তখন এগারোটা হবে। কোলাপ্‌সিবল্ গেটে অনেক আগে তালা পড়ে গেছে। মেজদা মেজোবৌদি বাড়ি নেই। বিকেলে কোন্নগরে গেছেন। আজ আর ফিরবেন না। সুতরাং নীচের পাট সেরে বৌদিও অন্যদিনের চেয়ে একটু আগেই উপরে চলে গেছেন।

টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে শুয়ে শুয়ে মহাকাশ সংক্রান্ত একটা বই পড়ছিলাম। মনে হলো রাস্তার ধারের গেটটা খুলে কে যেন বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। জুতোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তারপর বারান্দার কোলাপ্‌সিবল গেটের তলায় খট্ খট্ শব্দ, অর্থাৎ বাড়ির লোকজনদের ডাকছে। তাহলে পরিচিত লোকই কেউ হবে হয়তো। আমি নিজে কোনো সাড়াশব্দ করলাম না। করবার অনুমতি নেই। ততক্ষণে ব্যালকনির আলো জলে গেছে। বড়দা উপর থেকে জানতে চাইছেন--"কে ?"—

নীচ থেকে সাড়া পাওয়া গেল—"আমি। গেটটা খুলুন।"

বড়দা গলাটা ঠিক ধরতে না পারলেও আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না।

চাঁদু! এত রাত্রিতে চাঁদু বাড়িতে এসেছে হামলা করতে!

উপর থেকে আবার বড়দার গলা শোনা গেল—"আমি কে?"—

"আমি চাঁদু। চন্দ্রনাথ মিত্র।"

আর বিছানায় থাকতে পারলাম না। দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম। সুইস্ টিপে ওপাশের বারান্দাটা ফর্সা করে দিলাম। তার আগেই ছুটে নেমে এলেন বৌদি। চাপা গলায় বললেন, "তুমি বেরোবে না, ছোট ঠাকুরপো।

বড়দাও নেমে এসেছেন। দু'জনেই সামনের বারান্দায় চলে গেলেন।

"কী ব্যাপার চাঁদু?"

বড়দা জিজ্ঞেস করলেন।

"গেটটা খুলুন না, ভয় নেই।"

চাঁদু তার সহজাত দীপ্তস্বরেই বললো।

বৌদিকে পেছনে ফেলে বড়দার পাশে এসে দাঁড়ালাম। চাঁদুর চোখে চোখ রেখে বললাম, "রাত দুপুরে এভাবে বাড়িতে হামলা করতে আসা—কাজটা ঠিক হয় নি।"

"আ! ছোট ঠাকুরপো!"

বৌদি আমাকে সরিয়ে দিলেন।

চাঁদু কিন্তু উত্তেজিত হলো না।

"তুই ভেতরে যা তরুণ।" বড়দা আদেশ করলেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে চাঁদু অভয় দিলো—"আমি কোনোরকম

গণ্ডগোল করতে আসি নি, বড়দা। আপনি ইচ্ছে করলে গেট খুলতে পারেন। না খুললেও আপত্তি নেই।"

"কিন্তু এত রাত্রিতে"—

"এত রাত্রিতে এভাবে একা কেউ হামলা করতে আসে না।"

কথাটা শুনে বড়দা বৌদির মুখের দিকে তাকালেন। কী একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, "চাবিটা দাও।"

বৌদি ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, গেট খুলতে হবে না।

চাঁদু সেটা বুঝে নিয়ে বললো, "বেশ বেশ, আপনাদের যখন এতই ভয়, খুলতে হবে না। আমি এখানে দাঁড়িয়েই বলছি।"

বড়দা বোধহয় ভেতরে ভেতরে একটু লজ্জিত হলেন। বললেন, "না না, সে কেন? আমি গেট খুলে দিচ্ছি।"

"দরকার নেই।" চাঁদু একমুহূর্ত কী ভাবলো, তারপর প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একতোড়া দশটাকার নোট বের করে গেটের ফাঁক দিয়ে বড়দার সামনে ধরে বললো, "কাল তরুণকে দিয়ে টাকাটা আমার দিদির কাছে পাঠিয়ে দিলে খুব উপকার হয়। হাজার দেড়েকের মতো আছে।"

বড়দা গম্ভীর হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "আরো কিছু বলবে?"

"আপনি মিছে ভয় পাচ্ছেন। আমার যাবার উপায় থাকলে আপনাদের বিরক্ত করতে আসতাম না।"

চাঁদুর শেষের কথাক'টি যেন অনুনয়ের মতো শোনালো।

"তোমার দলের লোক তো রয়েছে, তাদের কাউকে দিলেই তো পারো।"

"দলের লোকের কথা ভাবলে এত রাত্রিতে নিশ্চয়ই আপনার কাছে আসতাম না।" একটু থামলো চাঁদু। "আপনি

পারেন তো বলুন।"

"আমি ঠিক—তুমি কিছু মনে করো না, চাঁদু।"

বড়দা খানিকটা ইতস্ততঃ করে বললেন।

"বেশ। আমি যাচ্ছি।" বারান্দার সিঁড়ি থেকে নেমে একটু দাঁড়ালো চাঁদু। "তরুণ আমার দল ছেড়েছে বলে আমি কিন্তু সেই আক্রোশে আপনাদের কোনো বিপদে ফেলতে চাইছি না। দল ছেড়েছে ভালোই করেছে। সবাই তো আর আমার মতো খারাপ হয়ে যেতে পারে না! খারাপ হবার কারণ আর ক'জনের থাকে বলুন! আপনাদের কষ্ট দিলাম, ক্ষমা করবেন।"

চাঁদু খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল। ক্ষমা চাওয়ার মধ্যেও যে বীরত্ব আছে, অহংকার আছে, গৌরব আছে, মহত্ত্ব আছে তাই বুঝিয়ে দিয়ে—যেন বীরের মতোই চলে গেল।

বড়দা বললেন, "ওকে ভেতরে না এনে অন্যায় হয়েছে।"

বৌদি কিছু বললেন না। হয়তো মনে মনে মেনে নিয়েছেন কথাটা।

"ওর ভেতরে কোনো একটা দুঃখ রয়েছে, সুমি। শুনলে না—বলেছিল, খারাপ হবার কারণ ক'জনের থাকে? এই যে ছেলে-গুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাদের বেশীর ভাগের পেছনে দেখবে, নষ্ট হবার কোনো না কোনো কারণ আছেই।" উপরে যেতে যেতে বড়দা বললেন। "মানুষ যত মন্দই হোক, তার উপরেও কিছুটা বিশ্বাস অন্ততঃ রাখতে হয়। কিন্তু আমরা তা পারি না। না পারাটাই স্বাভাবিক।"

অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম হলো না। ভাবছি শুধু চাঁদুর কথা। তার কাছে শেষ পর্যন্ত আমার পরাজয়ই হলো।

মনে করেছিলাম চাঁদুর সঙ্গে একদিন দেখা করবো। কিন্তু

সে-সুযোগ আর হলো না। পরদিন দিল্লীরোডের কাছে একটা জলার ধারে তার ক্ষত-বিক্ষত লাশটা পাওয়া গেল।

ইচ্ছে থাকলেও একবার দেখতে যেতে পারি নি। নিভৃতে বসে তার কথা ভাবি—চোখে মাঝে মাঝে এই ভেবে জলও আসে যে চাঁদু কিন্তু আমাকে চিনতে ভুল করে নি। তার সঙ্গে মিশে আমি অনেক হারিয়েছি কিন্তু যা পেয়েছি তার মূল্যও সামান্য নয়।

চাঁদুর এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমাদের সবার মনে একটা বিষাদের ছায়া নেমে এলো।

● ● ✪

পরদিন সন্ধ্যার পর মেজদা বড়দার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুখটা ভারাক্রান্ত। আমি আর বৌদিও ঘরের ভেতরে ছিলাম। শোনলাম দিল্লীরোডের ঘটনাটার দরুন আমাকে কিছুকাল উপরেই থাকতে হবে এবং সেটা খোদ বড়দার ঘরে। বৌদি মা'র সঙ্গে নীচে থাকবেন।

"তুমি কি ব্যস্ত আছো, বড়দা ?"

মেজদা জানতে চাইলেন।

"না। ভেতরে আয়।"

মেজদা এলেন।

"কিছু বলবি ?" বড়দা মেজদার মুখের দিকে তাকালেন।

মেজদা একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, "তোমরা সবাই আছো, ভালোই হয়েছে। আমি ভেবে দেখলাম বড়দা, এর একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।"

"কিসের ?"

"যাতে সবার ভালো হয়, তেমন কিছু করাই উচিত।"

"সবার ভালো-মন্দ দেখে লাভ নেই। তুই তোর নিজের কথা বল।"

"আমাকে তোমরা যেতে দাও, বড়দা।"

"কথাটা তুই বলতে পারলি, বরুণ ?"

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন বড়দা। "আমার মনে পড়ে না এমন কী ঘটনা ঘটেছে অথবা কী এমন অপরাধ আমি করেছি যার জন্যে তুই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাস !"

"অপরাধ কেউ করে নি। তবে আমার মনে হয়, আমি যা বলছি তা করলেই ভালো হতো।"

বড়দা অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, "যেটা ভালো হয় তোরা কর। হয়তো আমি ভুলই করছি। তবে একটা কথা জেনে রাখ বরুণ, জীবনে কারো কাছে আমার আশা খুব বেশী ছিল না। শুধু চেয়েছিলাম তোদের নিয়ে মিলেমিশে জীবনটা কাটিয়ে দেব। এ-ছাড়া আমার জীবনে আর কী-ই-বা আছে ! রাজাটাকে মনের মতো করে মানুষ করতে চেয়েছিলাম। হয়তো হয়ে উঠবে না। তোর বৌদি তো ওর উপর কোনো নজরই দিতে পারে না। তবু তোরা থাকলে, অন্ততঃ একটু দেখাশুনা করে তো রাখতে পারতিস। যাক্, সেসব কথা বলে আর লাভ নেই। আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে তোদের জীবন নষ্ট হোক—এটা আমি চাই না। আমার নিজের জন্যে কোনোদিন কিছু ভাবি নি, নিজের সুখটা বড় করে কোনোদিন দেখি নি। তোদের নিয়েই সব পেতে চেয়েছিলাম। তা যখন তোরা চাস না, আমার আর কী করবার আছে ! যা বিবেক চায় কর, বাধা দেবো না।"

ক্রাচ দুটি টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বড়দা। বললেন, "আজ অনেক কথাই মনে পড়ছে, বরুণ। উনিশশো পঞ্চাশ সনে বাবা যখন নিঃসম্বল হয়ে আমাদের নিয়ে এ-দেশে আসেন, সে-সমস্ত দিনের কথা তোর হয়তো ভালো করে মনে নেই। তরুণ তখন কোলে। এক আত্মীয়ের বাড়িতে একটা ভাঙ্গা টালির চালায় বাবা আমাদের নিয়ে মাথা গুঁজেছিলেন। জিনিসপত্রের দাম তখন এত চড়া ছিল না। মানুষ দু'বেলা পেট ভরে ভাতই খেতো। রুটির প্রয়োজন এত হয় নি। আমাদের মতো লোকেরা খেতেও পারতো না। কিন্তু মা আমাদের পাতে দুপুরেও ক'টি শুকনো রুটি দিয়ে আড়ালে চোখের জল ফেলতেন। আমরা কিন্তু নির্বিকারে তাই ভাগাভাগি করে খেতাম। হয়তো আমার ভাগে বেশীই পড়তো। সেদিন কেন বললি না বরুণ, বড়দা, তুমি বেশী খাচ্ছ, আমি তোমার সঙ্গে খাবো না, আমাকে আলদা খেতে দাও!"

বলতে বলতে বড়দার গলার স্বর কান্নায় বুজে এলো। চোখের জল লুকোতে ক্রাচে ভর দিয়ে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

"বরুণ, হয়তো সে-সব দিনগুলোই ভালো ছিল রে!"

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন মেজদা। ঠিক এই মুহূর্তেই কিছু বলতে পারেন না।

বড়দাও একটা ক্রাচে কপাল ঠেকিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমাদের কারো মুখেই কোনো কথা নেই। ঘরের মধ্যকার এই থম্‌থমে ভাব যেন আমাদের সব কথা কেড়ে নিয়েছে।

প্রাণপণে বলতে চেষ্টা করছি—বড়দা, তুমি ভয় পেও না। দুঃখ করো না। আমরা তোমার পাশে চিরদিন থাকবো, তোমার আদর্শকে অশ্রদ্ধা করবার ক্ষমতা আমাদের যেন কোনোদিন না

হয়। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করবো, রাজাকে ঠিক তোমার মতন করে মানুষ করতে।

কিন্তু বলতে পারলাম না। মনের উপর সবসময় বিশ্বাস রাখা বড় শক্ত। তাই এই সামান্য কয়েকটি কথা উচ্চারণ করা খুব কঠিন বলে মনে হলো।

॥ সমাপ্ত ॥